# মুক্তিযুদ্ধে
# বীর মুক্তিযোদ্ধাদের বীরত্বগাঁথা
## পর্ব-১

**সংকলক**

মো. মাসুদুল করিম অরিয়ন

**সম্পাদক**

মো. আসাদুজ্জামান (মামুন)

**তাকিয়া মোহাম্মদ পাবলিকেশন্স**
**১১,১১/১ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০।**



**প্রকাশক** : **মো. আসাদুজ্জামান (মামুন)**
বি.এস.এস. (অর্থনীতি); এম.এস.এস. (জাঃবিঃ)
☎ ০১৭ ১২৮৯৯৮৮৯, ০১৯১১০৩৩৩৩৬.

**প্রথম প্রকাশ** : ২৬ মার্চ ২০২১
**গ্রন্থস্বত্ব ©** : মুক্তিযোদ্ধার ইতিহাস সংরক্ষণ কমিটি বাংলাদেশ

**পরিবেশক** : জয় স্টার বুক হাউস
গিয়াস গার্ডেন মার্কেট, বাংলাবাজার, ঢাকা
০১৯১৫৭৮৬৬২১

**প্রচ্ছদ পরিকল্পনা** : মো. আসাদুজ্জামান (মামুন)
**প্রচ্ছদ** : মো. শফিকুল ইসলাম
**অলংকরণ** : আয়শা নকিব

**মূল্য : ১২০ টাকা**

**ISBN : 978-984-91094-7-1**

## উৎসর্গ

হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙ্গালি
জাতির জনক শেখ মুজিবুর রহমান
ও
মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী
সকল বীর মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি

মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বাস্তবায়নের জন্য নতুন প্রজন্মের মাঝে মুক্তিযোদ্ধাদের অবদান, আদর্শ ও ত্যাগের ইতিহাস ছড়িয়ে দিয়ে তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করতে হবে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় এবং গড়ে তুলতে হবে দেশপ্রেমিক হিসেবে।

মুক্তিযুদ্ধ বাঙ্গালীর কয়েক হাজার বছরের কালজয়ী ও সর্বশ্রেষ্ঠ ঘটনা। অসীম সাহসীকতা, বীরত্ব, আত্মত্যাগ আর অবর্ণনীয় দুঃখকষ্ট উৎরে যাওয়ার এক বড় ক্যানভাস। মুক্তিযুদ্ধের অনেক ইতিহাসই রচিত হয়েছে কিন্তু এর সূর্যসৈনিক যারা জাতীর জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর ডাকে সাড়া দিয়ে নিজেদের জীবন বাজি রেখে মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল তাদের ইতিহাস নেই। কিন্তু তারা বাঙ্গালী, জাতির বীর ও সর্বশ্রেষ্ঠ সন্তান। আর এই প্রত্যেকটা মুক্তিযোদ্ধারই আছে আলাদাা আলাদা অসীম সাহসীকতা, বীরত্বগাঁথা দিনপঞ্জি ও আত্মত্যাগের ইতিহাস। কালের গহ্বরে অনেকেই আজ বিলীন হয়ে গেছেন, কিছু সংখ্যক এখনও বেঁচে আছেন, তাঁদের আমরা ক'জনই বা চিনি ও তাদের খোঁজ রাখতে পারি? এঁরাও একদিন আমাদের ছেড়ে চলে যাবে।

মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় দেশ গড়তে হলে সেই সব অকুতভয় কালজয়ী বীর মুক্তিযোদ্ধাদের বীরত্বগাঁথা ইতিহাস সংরক্ষণ অত্যন্ত জরুরী এবং আগামী প্রজন্মের কাছে এই সব মুক্তিযোদ্ধাদের অসীম সাহসীকতা, বীরত্বগাঁথা আত্মত্যাগের ইতিহাস পৌঁছে দেয়া আমাদেরই দায়িত্ব ও কর্তব্য।

**"মুক্তিযোদ্ধার ইতিহাস সংরক্ষণ কমিটি বাংলাদেশ"** স্বউদ্যোগে মুক্তিযোদ্ধাদের ব্যক্তিগত যুদ্ধের বীরত্বগাঁথা ইতিহাস সংরক্ষণ, প্রত্যক্ষদর্শীর যুদ্ধের বর্ণনা ও মুক্তিযোদ্ধাদের জীবনচিত্র বর্তমান ও আগামী প্রজন্মের কাছে তুলে ধরার লক্ষ্যে ওয়েবসাইট **www.mssangsad.com** ও বই আকারে প্রকাশ করার উদ্যোগ গ্রহণ করে। বর্তমান ও আগামী প্রজন্ম ও ৩২৭০টিরও বেশি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে "মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধকরণ কর্মশালা" সহ বিভিন্ন কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে আসছি। ভুয়াদের যুদ্ধের কোন বীরত্বগাঁথা নেই আর এরা দেশের শত্রু ও দেশের জনগণের সম্পদ বিনষ্টকারী।

পরিশেষে সরকার ও স্বাধীনতার স্বপক্ষের প্রত্যেক ব্যক্তিবর্গের কাছে সার্বিক সহযোগীতা কামনা করছি।

**ধন্যবাদান্তে**

মো. মাসুদুল করিম অরিয়ন
সভাপতি ও উদ্যোক্তা (মুক্তিযোদ্ধার ইতিহাস সংরক্ষণ কমিটি বাংলাদেশ)
Facebook: মাসুদুল করিম অরিয়ন মোবাইল: ০১৭১৫৪৪৮৪২৮
Youtube: MISC BD

যুদ্ধ কখনো হয় না কভু শেষ! সেই যে ঊনশত্তর থেকে কত আন্দোলন, সংগ্রাম, স্বাধীনতার জন্য মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করে পাকিস্তানি হানাদারদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করে সম্মুখযুদ্ধ আরম্ভ করলাম। বিজয়ও ছিনিয়ে আনলাম কিন্তু বিজয়ের পরও কি বিশ্রাম মিলেছে? না প্রজন্মের পর প্রজন্ম ওরা যেন সেই ভুতের গল্পের মত প্রতি নিয়তই জন্ম হচ্ছে। আর আমারও যুদ্ধ থামে না, থামাতেই পারছিনা। ওরা আমার সোনার বাংলায় জন্ম নিয়ে আজও হতে পারেনি আমার বাংলাদেশের বাঙালি। ওরা আজও জিন্দাবাদ স্লোগানের সাথে পাকছার জমিনের গজলে উল্লাশিত হয়, আনন্দিত হয়। ওরা বিশ্বাস করতে চায় না ওদের প্রিয় পাকিস্তানের হানাদারদের দ্বারা এই দেশে ত্রিশ লক্ষ শহীদের হত্যার কথা, দুই লক্ষ মা-বোনদের উপর নির্মম পাশবিক নির্যাতনের কথা। নিদারুন কষ্টের দিনগুলোর কথা। না এসব ইতিহাস আমাদের দেশের জন্য ওদের বুকে এতটুকুও মমতা ঝড়ায় না বরং পাকিস্তানের একটা কুকুর মারা গেলেও ওরা সেই কুকুরে জন্য বেহেশতের আবদার করে দোয়া করে। আর এদেশের শত শত লোকের মৃত্যুতেও ওদের কোন মনকষ্টের কারণ হয় না অথচ এরা এদেশেরই খায়, পরে আর কথাও বলে বাংলায় অথচ একটি বারের জন্য ও বাংলা মায়ের জন্য প্রাণ কাঁদে না। ওরা পাকিস্তানের জন্য শহীদ হতে চায় কিন্তু বাংলাদেশের জন্য একটু দরদও ওদের অন্তরে জাগ্রত হয় না। সবচেয়ে মজার ব্যাপার হচ্ছে পাকিস্তানের জনগণ বা সরকার এদের মুসলমান বলেও মানতে নারাজ। তারা এদের কুকুর তুল্যও মনে করে না। কিন্তু দুঃখজনকভাবে এরা এই দেশের আমাদের পরশী, সাথী হিন্দু ভাইদের মন্দির আক্রমণ করে, মূর্তি ভাংচুর করে, অগ্নিসংযোগ করে আনন্দে জংলী পিশাচের মত উল্লাস করে। বৌদ্ধদের প্যাগোডায়ও আক্রান্ত হয়ে অগ্নি সন্ত্রাসের স্বীকার হয়। খৃষ্টানরাও নিরাপদ থাকতে পারে না। ধর্মের নামে অপরাজনীতি করে আজও পাকিস্তানের প্রতিনিধিত্ব করে যাচ্ছে। আমি কি যুদ্ধ থামাতে পারি? আমি গর্জে উঠি আবার। অসাম্প্রদায়িক সোনার বাংলাদেশ আমার মুক্তিযুদ্ধের বিশাল অঙ্গীকার। আমার বঙ্গবন্ধুর আদর্শের অন্যতম প্রতিশ্রুতি। আমি বিভাজন বুঝিনা আমাদের সম্প্রদায়ের সাথে সম্প্রদায়ের। আমি বাঙালী জাতিসত্ত্বায় বিশ্বাসী। এ আমার অহংকার। এ আমার ধর্মীয় শিক্ষা। একজন বাঙালি মুসলিম হিসেবে এ আমার জাতীয় দায়িত্ব। তাই যারা বিভাজন করে রাজনৈতিক ফায়দা হাসিলের চেষ্টায় মগ্ন, আমি সেই রাজাকার প্রজন্মদের সাথে এই বয়সেও যুদ্ধই করে যাচ্ছি। জানি ক্লান্তি আমাকে স্তব্দ করতে পারবেনা কোনদিনই। আমি ক্লান্ত হবো না, না হবো না আমি। আমার সেই শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত। এ আমার গৌরব। দেশের তরে, জাতির জন্য দেশপ্রেম আজও বুকের মধ্যে বিদ্যমান। এজন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি মহান আল্লাহর কাছে। আমৃত্যু তা যেন আব্যহত রাখতে পারি। কখোনোই যেন বিচ্যুত না হই সৎ আদর্শ থেকে। এই মাতৃভূমির একজন বীরমুক্তিযোদ্ধা হিসেবে এ আমার নৈতিক দায়িত্ব ও শিক্ষা এবং কর্তব্য। আমি আমরণ এই আশা ধরে রাখি অন্তরে। দেশবাসী আমাকে দোয়া করবেন আমি যেন এই মুক্তিযুদ্ধের আদর্শ ও চেতনা বুকে ধারণ করেই মৃত্যুবরণ করতে পারি। চাওয়া পাওয়ার কিছুই নেই। মায়ের সেবার কোন বেতন হয় না। মায়ের ইজ্জত রক্ষায় সদা নিবেদিত পুত্ররা এমনই হয়। জয়বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু, বেঁচে থাকুক আমার সোনার বাংলাদেশ শেষ সূর্যাস্ত পর্যন্ত।

**ধন্যবাদান্তে**

বীর মুক্তিযোদ্ধা মো. হাবিবুর রহমান (লেখক ও কবি)
উপদেষ্টা
মুক্তিযোদ্ধার ইতিহাস সংরক্ষণ কমিটি বাংলাদেশ

## বীর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুর রব

**পয়ারী, ফুলপুর, ময়মনসিংহ**

সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ আমার অহংকার, (বীর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুর রব) বাঙ্গালী জাতির শ্রেষ্ঠ অর্জন মহান স্বাধীনতা। সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী, স্বাধীনতার মহান স্থপতি, মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর নির্দেশে আমরা মুক্তিযোদ্ধারা ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধে জীবন বাজি রেখে ঝাঁপিয়ে পড়ি। বিশেষ করে বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণে অনুপ্রাণিত হয়েই আমি স্বশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করি। বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ৭ মার্চের ঘোষণা অনুযায়ী বাঙ্গালী জাতি অসহযোগ আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং বঙ্গবন্ধুর নির্দেশানুযায়ী তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান তথা বাংলাদেশের শাসন ব্যবস্থা সবার্ত্মকভাবে পরিচালিত হয়। তখন আমি ময়মনসিংহ জেলার ফুলপুর ডিগ্রি কলেজে আই.এ ২য় বর্ষের ছাত্র এবং ফুলপুর থানা ছাত্রলীগের কার্যকর কমিটির সদস্য। ছাত্রলীগের একজন সদস্য হিসেবে ফুলপুর থানায় গঠিত সংগ্রাম কমিটিতে বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখি। তখন চারদিক সভা-সমাবেশ, মিটিং-মিছিলে, স্লোগানে স্লোগানে মুখরিত ছিল। আমাদের স্লোগান ছিল : 'তোমার আমার ঠিকানা, পদ্মা-মেঘনা-যমুনা; তুমি কে, আমি কে, বাঙ্গালী, বাঙ্গালী; তোমার নেতা, আমার নেতা, শেখ মুজিব, শেখ মুজিব; বীর বাঙ্গালী অস্ত্র ধর, বাংলাদেশ স্বাধীন কর; জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু। যুদ্ধের প্রস্তুতি হিসেবে আমরা প্রায় একশত ছাত্র, যুবক ছাত্রনেতা আবুল মনসুর সরকারের নেতৃত্বে পয়ারী হাই স্কুল মাঠে বাঁশের লাঠি দিয়ে শারীরিক প্রশিক্ষণ এবং ফুলপুর হাইস্কুলে মাঠে ফুলপুর থানার আলী আকবর দারোগার কমান্ডে থ্রি নট থ্রি রাইফেল প্রশিক্ষণ গ্রহণ করি। কিন্তু পাকিস্তান হানাদার বাহিনী ২৫ মার্চ কাল রাত্রে পিলখানা ইপিআর ক্যাম্প, রাজারবাগ পুলিশ ক্যাম্প ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন হলে অতর্কিত আক্রমণ চালায়। সমগ্র ঢাকায় নির্বিচারে গণহত্যা শুরু করে। ২৬ মার্চ প্রথম প্রহরে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ওয়ারল্যাসের মাধ্যমে স্বাধীনতার ঘোষণা দেন। শুরু হয় প্রতিরোধ যুদ্ধ। দেশপ্রেমিক বাঙ্গালি সেনাবাহিনী, ইপিআর, পুলিশ ও আনসার প্রতিরোধ যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে। অন্যদিকে পাকহানাদার বাহিনী ঢাকাসহ একের পর এক সারা বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকায় অবস্থান নিয়ে অবাধে গনহত্যা ও পাশবিক নির্যাতন চালায়। জ্বালিয়ে পুড়িয়ে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিতে চায় বাংলাদেশকে। পাকিস্তানি সামরিক জান্তা পুরামাটি নীতি গ্রহণ করে। ২৬শে মার্চ



স্বাধীনতার ঘোষণার পরপরই বাঙ্গালি জাতির অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে পাক-হানাদার বাহিনী গ্রেফতার করে। গ্রেফতার করার পর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে রাষ্ট্রপতি ও তাঁর অবর্তমানে স্বাধীন বাংলাদেশের অন্যতম স্বপ্নদ্রষ্টা সৈয়দ নজরুল ইসলামকে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি এবং বঙ্গতাজ তাজউদ্দীন আহমেদকে প্রধানমন্ত্রী করে ১০ এপ্রিল গঠিত মুজিবনগর সরকারের শপথ অনুষ্ঠান ১৭ এপ্রিল মেহেরপুরের বৈদ্যনাথ তলার আম্রকাননে অনুষ্ঠিত হয়। মুজিবনগর সরকার গঠনের পর ভ্রাতৃপ্রতিম ভারত সরকার বাংলাদেশের যুবকদের প্রশিক্ষণ ও অস্ত্রের ব্যবস্থা করে। বাঙ্গালি দেশপ্রেমিক বাহিনীর প্রতিরোধ যুদ্ধের ফলে ২৩ এপ্রিল পর্যন্ত পাকহানাদার বাহিনীর কবল থেকে বৃহত্তর ময়মনসিংহ অঞ্চল মুক্ত থাকে। পাকহানাদার বাহিনী ময়মনসিংহ সীমান্ত অঞ্চল দখল করে নেয়ার পর ১৩ মে ফুলপুর থেকে আমরা প্রায় একশত ছাত্রযুবক সীমান্ত অতিক্রম করে মেঘালয় রাজ্যে প্রবেশের পদক্ষেপ নেই। কিন্তু ব্যর্থ হয়ে পুনরায় আবার গ্রামের বাড়ী পয়ারী হতে আমরা দুই বন্ধু মৃত্যুর ঝুঁকি নিয়ে দুই দিন ধরে পায়ে হেঁটে নালিতাবাড়ী সীমান্ত অতিক্রম করে ১জুন/১৯৭১ এ ভারতের মেঘালয় রাজ্যের ঢালুতে প্রবেশ করি। সেখানে আওয়ামী লীগ নেতা আব্দুর রাজ্জাক ভাইয়ের সহযোগিতায় ঢালু থেকে বারাঙ্গাপাড়া বাজার হয়ে মাচাংপানি শরণার্থী ক্যাম্প সংলগ্ন যুব ক্যাম্পে আশ্রয় নেই। তখন ঢালু যুব শিবির প্রতিষ্ঠিত হয়নি। এই ক্যাম্পে কয়েকদিন থাকার পর যুব ক্যাম্প প্রধান অধ্যক্ষ মতিউর রহমান এবং হাবিলদার ফজলুল হক কর্তৃক প্রশিক্ষণের জন্য রিক্রুট হয়ে ১০ জুন মেঘালয় রাজ্যের তুরা ট্রেনিং সেন্টারে ভারতীয় সেনাবাহিনীর গাড়ীতে করে গমণ করি। উক্ত ট্রেনিং সেন্টারে উইং কমান্ডার মোহাম্মদ আলী হোসেনের নেতৃত্বে ১ মাস (জঙ্গল ট্রেনিং সহ) বিভিন্ন অস্ত্রসহ এক্সপ্লোসিভ (ইঞ্জিনিয়ারিং) প্রশিক্ষণ গ্রহণ করি। প্রশিক্ষণ শেষে ১১নং সেক্টরের অধীনে ঢালু সাবসেক্টরে বারাঙ্গা পাড়া বাজার সংলগ্ন এফ এফ ক্যাম্পে অবস্থান নেই। তখন বাংলাদেশের সর্বত্র গেরিলা যুদ্ধ চলছে। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বিভিন্ন রনাঙ্গনে আমরা সশস্ত্র যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ি। গেরিলা অপারেশনে নাগলা ব্রীজ ধ্বংস জুলাই মাসের তৃতীয় সপ্তাহ। পরিকল্পনা হয় গেরিলা পদ্ধতিতে নাগলা ব্রীজ ধ্বংস করতে হবে। ময়মনসিংহ জেলা সদরের সাথে নালিতাবাড়ী, হালুয়াঘাট ও ধোবাউড়া সীমান্তবর্তী এলাকায় শত্রুবাহিনীর যোগাযোগের প্রধান মাধ্যম ছিল ময়মনসিংহ, ফুলপুর, হালুয়াঘাট পাকা সড়ক পথ। মুক্তিযুদ্ধের সময় গুরুত্বপূর্ণ এ সড়ক পথ দিয়েই পাক হানাদার বাহিনী ও তাদের দোসর রাজাকার, আলবদররা যাতায়াত করত এবং সীমান্ত এলাকার বিভিন্ন ফাঁড়িতে তাদের রসদ, অস্ত্রশস্ত্র, গোলাবারুদ ইত্যাদি সরবরাহ করত। এ

সড়কে নাগলা বাজার সংলগ্ন ভোগাই নদীর উপর গুরুত্বপূর্ণ নাগলা ব্রীজের অবস্থান। উত্তর-দক্ষিণে প্রায় ৮০ ফুট দীর্ঘ আরসিসি নির্মিত এ ব্রীজ। এ ব্রীজ ধ্বংস করা হলে ময়মনসিংহের উত্তরাঞ্চলের সাথে শত্রুবাহিনীর যোগাযোগ বাধাগ্রস্ত হবে। এরা ভীত সন্ত্রস্ত ও আতঙ্কগ্রস্ত হবে। এদের পরাজয়ে পথ প্রশস্ত হবে। নাগলা ব্রীজ ধ্বংস করার জন্য এক্সপ্লোসিভ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত (ইঞ্জিনিয়ারিং ট্রেনিং প্রাপ্ত বলা হত) মুক্তিসেনা প্রয়োজন। তাই কমান্ডার আব্দুল হক এর নেতৃত্বে ভারতের মেঘালয় রাজ্যের তুরা ট্রেনিং সেন্টারে সদ্য ট্রেনিংপ্রাপ্ত আমরা তিনজন এক্সপ্লোসিভ ব্যবহারকারী মুক্তিযোদ্ধাসহ ৪১ জন মুক্তিযোদ্ধার একটি গ্রুপকে এ অপারেশনের জন্য প্রস্তুত করা হয়। আমরা এক্সপ্লোসিভ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত তিনজন মুক্তিযোদ্ধা ছিলাম কমান্ডার আব্দুল হক, ফারুক আহম্মেদ ও আমি আব্দুর রব। ২০ জুলাই বিকেল বেলায় ৪১ সদস্য বিশিষ্ট আমরা এ মুক্তিবাহিনী গ্রুপটি প্রয়োজনীয় অস্ত্রশস্ত্র, গোলাবারুদ ও ১৬০ পাউন্ড প্লাস্টিক এক্সপ্লোসিভসহ সংশ্লিষ্ট বিস্ফোরক সামগ্রী নিয়ে এফ এফ ক্যাম্প থেকে বারমারী ও হাতিবান্দা পাকসীমান্ত ফাঁড়ির মধ্যবর্তী স্থান দিয়ে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করি। তখন প্রায় সন্ধ্যা, অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে। মুশলধারে বৃষ্টি ঝড়ছে। এ অবস্থায় একরাত ও একদিন বৃষ্টিতে ভিজে অবিরাম পায়ে হেটে, কখনো কখনো খালবিল, নদীনালা নৌকায় পাড়ি দিয়ে ২১ জুলাই সন্ধ্যার সময় হালুয়াঘাট থানার পাবিয়াজুরি স্কুল মাঠে পৌঁছি এবং সেখান থেকে অত্যন্ত ক্লান্ত, পরিশ্রান্ত অবস্থায় আমরা মুক্তিযোদ্ধারা পার্শ্ববর্তী রামনগর গ্রামে মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার মোহাম্মদ আলী হোসেনের বাড়ীতে সেল্টার নেই। রাতে ঐ বাড়ীর নারী পুরুষ সকল সদস্যগণ নিজেদের খাবার আমাদের খেতে দিয়েছেন এবং নিজেরা না ঘুমিয়ে আমাদের ঘুমুতে দিয়েছেন। পর দিন ২২ জুলাই সকালে নাস্তা সেরে আমরা নিজেদের অস্ত্রশস্ত্র পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করি এবং ৫ আউন্সের প্লাষ্টিক এক্সপ্লোসিভ প্যাকেট খুলে একত্রে মিশিয়ে ২০ পাউন্ডের এক একটি "প্রেসার মাইন" তৈরি করি। আবার ঐ দিন দিনের বেলায় প্লাটুন কমান্ডার আতাউদ্দিন শাহ্ দুইজন মুক্তিযোদ্ধা ও একজন গাইড নিয়ে নাগলা ব্রীজে পাহারারত রাজাকারদের সঠিক অবস্থান পর্যবেক্ষণ (রেকি) করে আসেন। সন্ধ্যা হওয়ার পূর্বেই খাওয়া দাওয়া শেষ করে আমরা গন্তব্যের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করি। বেশ কয়েকটি খাল বিলের পাড় ঘেষে ধান ক্ষেতের আইল দিয়ে, কখনও হাঁটু পানির মধ্য দিয়ে বড় বড় জোঁকের কামড় উপেক্ষা করে রাত অনুমান ১২.৩০ টার সময় নাগলা বাজারে পশ্চিম পার্শ্বে একটি জায়গায় অবস্থান গ্রহণ করি। অবস্থান থেকে কমান্ডার আব্দুল হক এক্সপ্লোসিভ ব্যবহারকারী মুক্তিযোদ্ধা ফারুক ও আমাকে সাথে নিয়ে এক্সপ্লোসিভ ও অন্যান্য বিস্ফোরক সামগ্রী



বহনকারী মুক্তিযোদ্ধাদের প্রস্তুত করেন। আর কমান্ডার আতাউদ্দিন শাহ্ বীর মুক্তিযোদ্ধা বদিউল আলম রতন, বিমলচন্দ্র পাল, শামছুল হক, সৈয়দ আলী, আব্দুর রউফ, হাবিবুর রহমান, নজরুল ইসলাম, শরাফ উদ্দিন ও জামাল উদ্দিনকে নিয়ে একটি অগ্রবর্তী গ্রুপ তৈরি করেন। ২৩ জুলাই প্রথম প্রহরে রাত অনুমান ১.০০ টার সময় পূর্ব তথ্যমত হালুয়াঘাট থেকে একটি এবং ফুলপুর থেকে একটি জীপ এসে উক্ত ব্রীজের উপরে থামে। কয়েক মিনিট অপেক্ষা করার পর জীপ দুটি আবার দুই দিকে চলে যায়। এগুলো ছিল পাকবাহিনীর নিয়মিত টহল গাড়ী। গাড়ী দুটি চলে যাওয়ার সাথে সাথে পরিকল্পনা অনুযায়ী আমাদের অবস্থান ত্যাগ করে আরও অগ্রসর হয়ে ব্রীজের প্রায় ৫০০ গজ দূরে অবস্থান নেই। উক্ত অবস্থানে ২০ জন মুক্তিযোদ্ধাকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দিয়ে প্রস্তুত রেখে আব্দুল হকের নেতৃত্বে এক্সপ্লোসিভ ব্যবহারকারী ও বহনকারী আমরা ১১জন মুক্তিযোদ্ধা এবং আতাউদ্দিন শাহ্ এর নেতৃত্বে অগ্রবর্তী গ্রুপের ১০জন মুক্তিযোদ্ধা অগ্রসর হয়ে নাগলা ব্রীজের দক্ষিণ পার্শ্বে প্রায় ১০০ গজের মধ্যে পৌঁছালে ব্রীজ পাহারারত রাজাকাররা টের পেয়ে টর্চলাইটের আলো দিয়ে খুঁজতে থাকে। তখনকার কমান্ডার আতাউদ্দিন শাহ, এল.এম.জি. দিয়ে ব্রাস ফায়ার করেন এবং অন্যান্য মুক্তিযোদ্ধাগণ গুলিবর্ষণ শুরু করেন। কিন্তু ব্রীজে পাহারারত রাজাকাররা পাল্টা গুলি বর্ষণ না করে ভয়ে দৌড়ে পালিয়ে যায়। কাল বিলম্ব না করে এক্সপ্লোসিভ বহনকারী মুক্তিযোদ্ধাগণের সহযোগীতায় আমরা এক্সপ্লোসিভ ব্যবহারকারী মুক্তিযোদ্ধাত্রয় নাগলা ব্রীজের উপরে চার জায়গা তৈরী করা "প্রেসার মাইন" বসিয়ে এর সাথে ডেটোনেটর, করড্যাক্স ও সেফটি ফিউজের সংযোগ স্থাপন করি এবং তৈরী মাইনের উপর রাজাকারদের ফেলে যাওয়া সামগ্রী দিয়ে চাপ দেই যাতে বিস্ফোরন বেশি কার্যকর হয়। পরিশেষে আমাকে ও ফারুককে নিরাপদ দুরত্বে অবস্থান নিতে বলে আব্দুল হক সেফটি ফিউজে সেফটি ম্যাচ দিয় আগুন ধরিয়ে তিনিও তাড়াতাড়ি দৌড়ে নিরাপদ দূরত্ব অবস্থান নেন। মূহর্তের মধ্য ব্যবহৃত "প্রেসার মাইন" বিকট শব্দে বিস্ফোরনে নাগলা ব্রীজ ধ্বংস হয়। মহান মুক্তিযুদ্ধে নাগলা ব্রীজ ধ্বংস করা মুক্তিযোদ্ধাদের একটি সফল গেরিলা অপারেশন। এফ.এফ ট্রেনিং শেষে এটাই আমার প্রথম অপারেশন। বান্দরকাটা যুদ্ধ আগষ্ট মাসের প্রথম সপ্তাহ। পরিকল্পনা হয় শত্রুক্যাম্প বান্দরকাটা আক্রমণ করার। হালুয়াঘাট ও ধোবাউড়া সীমান্তবর্তী প্রায় মধ্যবর্তী স্থানে পাকহানাদার বাহিনীর বান্দরকাটা ক্যাম্প (বিওপি) অবস্থিত ছিল। সে ক্যাম্পে ছিল পাক বাহিনীর ৩৩ পাঞ্জাব রেজিমেন্টের ১ প্লাটুন পাকসেনা ও ১ প্লাটুন রাজাকার। শত্রুবাহিনীর এই ক্যাম্পের কারণে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে মুক্তিবাহিনীর প্রবেশ

নিরাপদ ছিল না। তাই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী উক্ত ক্যাম্প আক্রমণের জন্য কমান্ডার আবুল হাসেম এর নেতৃত্বে ৪১ জনের এবং পুলিশ হাবিলদার জিয়া উদ্দিনের নেতৃত্বে ৪১ জনের পৃথক পৃথক মুক্তিযোদ্ধা দলকে প্রস্তুত করা হয়। পরিকল্পনা হয় ৬ আগষ্ট রাত ৩ টায় কমান্ডার আবুল হাসেমের নেতৃত্বে আমাদের মুক্তিযোদ্ধা দলটি পশ্চিম দিক থেকে এবং হাবিলদার জিয়াউদ্দিনের নেতৃত্বে অপর দলটি উত্তর দিক থেকে আক্রমণ চালাবে। মুক্তিবাহিনীর বিপদের আশংকা দেখা দিলে ভেরী লাইট পিস্তল দিয়া ফায়ার করে সংকেত দেয়ার পর বিএসএফ আর্টিলারী গ্রুপ ফায়ার ওপেন করবে। এই সুযোগে মুক্তিবাহিনীর দল দুটি নিজেদের অবস্থান ত্যাগ করে নিরাপদ আশ্রয় ফিরে আসবে। পরিকল্পনা অনুযায়ী মুক্তিবাহিনীর দুটি দল অসমতল এলাকা দিয়ে বরাকজিরি নদী অতিক্রম করে স্ব স্ব অবস্থানের দিকে অগ্রসর হই। তখন মুষলধারে বৃষ্টি হচ্ছিল। যে কারণে মুক্তিবাহিনীর অবস্থান পাকবাহিনী টের পায়নি। রাত ৩টার পূর্বেই মুক্তিবাহিনীর দল দুটি ফায়ার ওপেন করে। এদিকে পাকবাহিনী ও রাজাকার পাল্টা গুলি বর্ষণ শুরু করে। শুরু হয় প্রচন্ড যুদ্ধ। প্রচুর বৃষ্টি ও রাস্তা পিচ্ছিল থাকার কারণে অগ্রসর হয়ে আমাদের পক্ষে বান্দরকাটা ক্যাম্প দখল করা খুবই অসুবিধা হচ্ছিল। এমনকি আমাদের পক্ষে কয়েকজন মুক্তিযোদ্ধা গুরুতর আহত হওয়ায় আমরা ভীত হয়ে পরি। সে সময় কমান্ডার আবুল হাসেম ভেরী লাইট পিস্তল দিয়ে ফায়ার করে সংকেত দেয়ার সাথে সাথে ভারতীয় অবস্থান থেকে বিএসএফ আর্টিলারী সাপোর্ট দেয়। তখন সূর্যের আলো দেখা যাচ্ছিল। ফলে আমরা মুক্তিযোদ্ধারা নিজেদের অবস্থান ত্যাগ করতে বাধ্য হই। এই বান্দরকাটা যুদ্ধে বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করে বীরমুক্তিযোদ্ধা আজিজুল হক বীরমুক্তিযোদ্ধা রিয়াজউদ্দিন এবং বীরমুক্তিযোদ্ধা আব্দুস সালাম শাহাদাৎ বরণ করেন। আর বীরমুক্তিযোদ্ধা রফিক উদ্দিন ভূইয়া, বীরমুক্তিযোদ্ধা আব্দুস ছামাদ ও বীরমুক্তিযোদ্ধা দীপক সাংমা গুরুতর আহত হয়। পরবতীর্তে জানা যায় এ যুদ্ধে ৩ জন পাকসেনাও ৭ জন রাজাকার প্রাণ হারায় এবং অনেক আহত হয়। বান্দরকাটা যুদ্ধে আমাদের সম্পূর্ণ বিজয় না হলেও পাকবাহিনীর স্বয়ংক্রিয় অত্যাধুনিক অস্ত্রের বিরুদ্ধে আমরা মুক্তিযোদ্ধারা সাধারণ অস্ত্র দিয়ে যুদ্ধ করে বীরত্বের পরিচয় দিয়েছি এবং পাকবাহিনী ও তাদের দোসর রাজাকারদের ভীতসন্ত্রস্ত ও আতঙ্কগ্রস্ত করে তুলেছি। বান্দরকাটা যুদ্ধে যেসব বীরমুক্তিযোদ্ধা বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করে গাজী হয়ে ফিরেছেন তারা হলেন- আবুল হাসেম, আব্দুর রব, নবী হোসেন, বদিউল আলম রতন, গাজী আমান উল্লাহ, শামছুল হক, আব্দুর রশিদ, নেকবর আলী, জয়নাল আবেদীন, অনিল সাংমা, বজলুর রহমান, জামাল উদ্দিন, নজরুল ইসলাম, সোহরাব আলী, গিয়াস উদ্দিন, আব্দুল হক, সেলিম



সাজ্জাদ, সামছুল হক বাদল, রবার্ট সরকার, কাজীম উদ্দিন, শাহজাহান আলী বাদশাহ্, আলাউদ্দিন, হযরত আলী, রঞ্জিত গুপ্ত, আহির উদ্দিন, আব্দুর রহমান, চন্দ্র কিশোর সরকার, পরেশ চন্দ্র সরকার, হরিশংকর মজুমদার, আবুল কাশেম, সৈয়দ আলী, আলী আহম্মদ দুদু, আবু তাহের, গোলাম মোস্তফা, মনোরঞ্জন দেব, আব্দুর রউফ, আকবর আলী, আব্দুস ছোবহান প্রমুখ। তন্তর যুদ্ধ, আগষ্ট মাসের শেষ সপ্তাহ। বাংলাদেশের বিভিন্ন রনাঙ্গনে মুক্তিবাহিনীর গেরিলা ও সম্মুখ যুদ্ধে পাকহানাদার বাহিনী ও রাজাকার, আলবদররা নাস্তানাবুদ হচ্ছিল। বিভিন্ন এলাকায় অপারেশন বা যুদ্ধের জন্য লালিতাবাড়ী সীমান্ত এলাকার তন্তর হয়ে মুক্তিবাহিনী বাংলাদশের অভ্যন্তরে নিরাপদে যাতায়াত করত। কিন্তু পাকহানাদার বাহিনী মুক্তিবাহিনীর প্রবেশ পথ বন্ধ করতে তন্তরে পরিত্যাক্ত আরফান মাষ্টারের বাড়ীতে একটি অস্থায়ী ক্যাম্প স্থাপন করে। এই ক্যাম্পে পাকবাহিনী ও রাজাকাররা রাত্রে অবস্থান করত এবং সকালে বারমারী ক্যাম্পে (বিওপি) চলে যেত। পরিকল্পনা অনুযায়ী ২৫ আগষ্ট ভোর ৫টার সময় কমান্ডার আতাউদ্দিন শাহ্ এর নেতৃত্বে আমরা এক প্লাটুন মুক্তিযোদ্ধা তন্তর ক্যাম্পের উত্তর দিকে প্রায় ৬/৭ শতগজ দূরে এ্যাম্বুশ নেই। পাকবাহিনী ও রাজাকাররা আমাদের অবস্থান টের পেয়ে আমাদের উপর আক্রমণ চালায়। আমরাও পাল্টা আক্রমণ করি। চলে তুমুল যুদ্ধ। এদিকে সূর্যের আলো ফুটে উঠে। আমরা এবং শত্রুবাহিনী একে অপরকে দেখতে পাচ্ছি। পাকবাহিনী আমাদেরকে ধরতে সামনের দিকে অগ্রসর হতে থাকলে কমান্ডার আতাউদ্দিন শাহ এল.এমজি দিয়ে ব্রাশ ফায়ার করে, মাটিতে লুটিয়ে পড়ে দুইজন পাকসেনা। আমরাও তখন ক্লান্ত হয়ে পড়ি। ভেরী লাইট পিস্তল দিয়ে ফায়ার করে সংকেত দেওয়ার সাথে সাথে ঢালু বিএসএফ ক্যাম্প থেকে আর্টিলারী শেল নিক্ষেপ করতে থাকে। এসময় আমরা আমাদের কোন ক্ষয়ক্ষতি ছাড়াই পশ্চাদপসরণ করে আমাদের ক্যাম্পে চলে আসি। তন্তর শত্রুক্যাম্প আক্রমণ করার উদ্দেশ্য ছিল পাকহানাদার বাহিনীকে ভীত সন্ত্রস্ত ও আতঙ্কগ্রস্ত করে তোলা। তন্তরে এভাবে একের পর এক আক্রমণ অব্যহত রাখা। যাতে পাকহানাদার বাহিনী তাদের তন্তর ক্যাম্প প্রত্যাহার করে চলে যায়। এভাবে তন্তরে কয়েকটি যুদ্ধ হয় অন্যান্য মুক্তিযোদ্ধা গ্রুপের সাথে। পরবর্তী সময় জানা যায়, পাকহানাদার বাহিনী মুক্তিবাহিনী তীব্র আক্রমণে তন্তর ক্যাম্প প্রত্যাহার করে নিতে বাধ্য হয়। তন্তর ক্যাম্প আক্রমণে ছিলাম আতাউদ্দিন শাহ, আব্দুর রব, নবী হোসেন, বদিউল আলম রতন, হাবিবুর রহমান, শামছুল হক, আব্দুস ছোবহান, চন্দ্র কিশোর সরকার, আলী আহম্মদ দুদু, আব্দুর রহমান, আব্দুর রশিদ তালুকদার, পরেশ চন্দ্র সরকার, হযরত আলী, হারন সাংমা, রঞ্জিত গুপ্ত, সৈয়দ

আলী, আব্দুর রউফ, আব্দুল হক, হরিশংকর মজুমদার, আবু তাহের, রফিকুল আলম, এম.এ তাহের, জামাল উদ্দিন, নজরুল ইসলাম, শরাফ উদ্দীন, মোঃ ইসরাইল, আব্দুর কাদির, গোলাম মোস্তফা চৌধুরী প্রমুখ। বীরত্বগাঁথা গেরিলা অভিযান সেপ্টেম্বর মাস। মহান স্বাধীনতার জন্য মুক্তিযোদ্ধারা জীবন-মরণ যুদ্ধে লিপ্ত। চারিদিকে পাকহানাদার বাহিনী ও তাদের দোসর রাজাকার, আলবদর বাহিনীর উপর বীর মুক্তিযোদ্ধাদের সাঁড়াশী আক্রমণ চলছে। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ময়মনসিংহ শহরে বিভিন্ন সেল্টারে অবস্থান নিয়ে গেরিলা কায়দায় ময়মনসিংহ শহরে বিভিন্ন অপারেশন সহ কেওয়াটখালী বৈদ্যুতিক পাওয়ার হাউজ ধ্বংস করতে হবে। কমান্ডার আবুল হাসেম এর নেতৃত্বে আমরা এক কোম্পানী অর্থাৎ ১০৫ জন মুক্তিযদ্ধো এ অভিযানের জন্য প্রস্তুত হই। ১৮ সেপ্টেম্বর সকালবেলায় ঢালু মুক্তিযোদ্ধা ক্যাম্প থেকে ৪টি এল.এম.জি সহ প্রয়োজনীয় অস্ত্রশস্ত্র, গোলাবারুদ, ডিনামাইট, পর্যাপ্ত হ্যান্ডগ্রেনেড ও ফায়ারগ্রোনেড নিয়ে আমরা মেঘালয়ের সীমান্ত রাস্তা দিয়ে বাসে চড়ে গন্তব্যের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করি এবং সন্ধ্যার সময় শিববাড়ী ইয়থক্যাম্পে পৌঁছে যাই। শিববাড়ী ইয়থক্যাম্প ইনচার্জ গৌরীপুরের জনাব হাতেম আলী এম.পি আমাদের স্বাগত জানান এবং সেখানে আমরা রাতযাপন করি। ১৯ সেপ্টেম্বর সকালে আমরা মার্চ করে নেওলাগিরি নামক স্থানে পৌঁছাই। সেখানে মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার তোফাজ্জল হোসেন চুন্ন এবং হাফেজ হাবিবুর রহমানের গেরিলা অপারেশন ক্যাম্প ছিল। এই ক্যাম্পে দুপুরে আহার করে বিশ্রাম নিয়ে আবার সন্ধ্যার সময় যাত্রা শুরু করি। সারা রাত অবিরাম পায়ে হেঁটে ও নদী-নালা নৌকায় পাড়ি দিয়ে কলসিদ্ধুর বাজারের পাশ দিয়ে ২০ সেপ্টেম্বর সকাল বেলায় মুক্তাঞ্চল গোয়াতলা বাজারে উপস্থিত হই। মুক্তাঞ্চলের কমান্ডার এখলাছ উদ্দিন আমাদের বিশ্রাম ও আহারের ব্যবস্থা করেন। গোয়াতলা বাজারে সারাদিন বিশ্রাম নিয়ে বিকেল বেলায় কংস নদী পার হয়ে সামনের দিকে মার্চ করি। সারারাত্র পায়ে হেঁটে ভোর বেলায় ফুলপুরের কালিখা গ্রামে বিভিন্ন বাড়ীতে আমরা অবস্থান গ্রহণ করি। ২১ সেপ্টেম্বর দিনের বেলায় সেখানে অবস্থান করে আবার সন্ধ্যার পরে পথ চলা শুরু করি। সে সময় আমরা দিনের বেলায় মার্চ না করে সাধারণত রাতের বেলায় মার্চ করতাম। যাতে শত্রুপক্ষ আমাদের গতিবিধি টের না পায়। এমনিভাবে সারারাত্র পায়ে হেঁটে সকালে সূর্য উঠার পূর্বে বিসকা ইউনিয়নের নগোয়া গ্রামে বীরমুক্তিযোদ্ধা আদুর রশিদ এর বাড়ীসহ আশেপাশের বাড়ীতে অবস্থান গ্রহণ করি। আবার সন্ধ্যার পর সেখান থেকে রওনা দিয়ে কলতাপাড়া বাজারের কাছাকাছি এসে জানতে পারি যে, কলতাপাড়া বাজারে কয়েকজন রাজাকার তাস খেলছে। ঐসব রাজাকারা জনণের উপর অত্যাচার



নির্যাতন করে, জনসাধারনের গরু, ছাগল ও ধনসম্পদ লুট করে এবং পাক বাহিনীর নিকট মুক্তিবাহিনীর খবরাখবর আদানপ্রদান করে। তাই কলতাপাড়া বাজার ঘেরাও করে দুই জন রাজাকারকে ধরে ফেলি এবং কমান্ডার আবুল হাসেম ও টু আই সি আতাউদ্দিন শাহ্ এদের মৃত্যুদণ্ড ঘোষণা করেন। বীর মুক্তিযোদ্ধা রবার্ট সরকার ও আকবর আলী মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করেন। সেখান থেকে পুনরায় মার্চ করে ভোর বেলায় ঈশ্বরগঞ্জের নাওভাঙ্গা বাজারের পূর্ব দিকে একটি গ্রামের কয়েকটি বাড়ীতে সেল্টার নেই। কিন্তু সেখানে অসর্তকতা বশতঃ আমাদের সাথী মুক্তিযোদ্ধা মুসলিম উদ্দিনের রাইফেল থেকে একটি মিস্ ফায়ার হয়ে যায়। তাই সে সেল্টারে অবস্থান নিরাপদ নয় ভেবে আরেকটি সেন্টারের উদ্দেশ্যে মার্চ করি। অত্যন্ত দূর্ভাগ্যজনক যে, পরবর্তী সেল্টারে পৌছার পূর্বেই সূর্য উঠে যায়। তাই ২৩ সেপ্টেম্বর দিনের বেলায় নাওভাঙ্গা বাজারে আমরা অবস্থান গ্রহণ করি। আমাদের অবস্থান টের পেয়ে এই এলাকার দুইজন কুখ্যাত পাকদালাল শম্ভুগঞ্জ ও উচাখিলা রাজাকার ক্যাম্পে খবর দেয় যে, নাওভাঙ্গা বাজারে ৫/৬ শত মুক্তিযোদ্ধা ক্যাম্প করেছে। বেলা অনুমান ১টার সময় শম্ভুগঞ্জ ও উচাখিলা থেকে পাকবাহনী ও রাজাকাররা অগ্রসর হয়ে আমাদের উপর দুই দিক থেকে আক্রমণ চালায়। নাওভাঙ্গা গ্রামের কৃতিসন্তান প্লাটুন কমান্ডার বীর মুক্তিযোদ্ধা হাফিজ উদ্দিন কর্তৃক গ্রামের বিভিন্ন বাড়ী থেকে সংগ্রহ করা খাবার তখন আমরা খাওয়ার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম। খাবার ফেলে রেখেই আমরা পাল্টা গুলি বর্ষণ শুরু করি। প্রায় ৩/৪ ঘণ্টা যুদ্ধের পর আমরা সেখানে অবস্থান করা বা নির্দিষ্ট সেল্টারে অগ্রসর হওয়া নিরাপদ বোধ করিনি। তাই আমরা সেখান থেকে বেক মার্চ করে সিধলা গ্রামে সেল্টার নেই। সেখানে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে, খিচা রাজাকার ক্যাম্প আক্রমণ করা হবে। সে অনুযায়ী ২৫ সেপ্টম্বর রাত অনুমান ১২টার সময় খিচা রাজাকার ক্যাম্পের পূর্বদিকে একটি জঙ্গলে আমরা পজিশন নিয়ে আক্রমণ শুরু করি। রাজাকাররাও পাল্টা গুলিবর্ষণ করে। কিছুক্ষণ গোলাগুলি চলার পর রাজাকাররা গুলিবর্ষণ বন্ধ করে দেয়। পরে জানতে পারি, রাজাকাররা তাদের ক্যাম্প ছেড়ে পালিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু অত্যন্ত দুঃজনক, যে জঙ্গলে আমরা পজিশন নিয়ে আক্রমণ শুরু করি সেখানে বিচুটি পাতার ঘষায় আমাদের শরীর খুব জ্বালাপোড়া করতে থাকে। তাই প্রকৃতির এই বিরূপ পরিবেশে টিকতে না পেরে আমাদের পজিশন প্রত্যাহার করে পরবর্তী সেল্টারের উদ্দেশ্যে মার্চ করি। ২৬ সেপ্টেম্বর ভোরবেলায় আমরা ফুলপুরের বৌলা গ্রামে সেল্টার নেই। সেখানে আমরা জানতে পারি যে, বালিয়া রাজাকার ক্যাম্পের রাজাকার কমান্ডার বসির মেকার এলাকায় গণহত্যা, ধর্ষণ, লুণ্ঠণ, অগ্নিসংযোগ সহ স্বাধীনতার পক্ষের জনগণের উপর

অত্যাচার নির্যাতন অবাধে চালাচ্ছে। তাই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় বালিয়া রাজাকার ক্যাম্প আক্রমণ করে কুখ্যাত রাজাকার বসির মেকারকে জীবিত ধরে আমাদের ক্যাম্পে নিয়ে যাব। এখানে উল্লেখ্য যে, খিচা রাজাকার ক্যাম্প আক্রমণের পূর্বে যদি ভাল করে রেকি করা হতো, তবে ঐ অপারেশন আমাদের সফল হত। সেখান থেকে অভিজ্ঞতা নিয়ে বালিয়া রাজাকার ক্যাম্প আক্রমণের পূর্বে কমান্ডার আতাউদ্দিন শাহ দুইজন মুক্তিযোদ্ধা আবু তাহের ও আব্দুস সোবহান এবং একজন গাইড নিয়ে ২৭ সেপ্টেম্বর সকাল বেলায় বালিয়া রাজাকার ক্যাম্প রেকি করে আসেন। পরিকল্পনা হয় আজ রাত্রেই বালিয়া রাজাকার ক্যাম্প আক্রমণ করা হবে। কারণ ২৮ সেপ্টেম্বর রাত ১০টায় বালিয়া রাজাকার ক্যাম্পে রাজাকার, আলবদরদের সাথে শান্তি কমিটির মিটিং হবে। মিটিং চলাকালীন সময়েই আমরা বালিয়া রাজাকার ক্যাম্প আক্রমণের জন্য সিদ্ধান্ত নেই। আমাদের পরিকল্পনা ছিল, রাত্র ১১টা থেকে ১২টার মধ্যে বালিয়া রাজাকার ক্যাম্প আক্রমণ করবো। কিন্তু সেল্টারে খাওয়া শেষ করে মার্চ করতে দেরি হওয়ায় আমরা যখন বালিয়া রাজাকার ক্যাম্পের প্রায় আধা কিলোমিটার পূর্ব দিকে পৌঁছাই তখন রাত প্রায় ১টা বেজে যায়। এমন সময় বালিয়া বাজারের দিক থেকে ৪/৫ জন রাজাকার আসতে থাকে। চাঁদের আলোয় রাজাকারদের দেখে আমরা সবাই পজিশন নেই এবং কমান্ডার আবুল হাসেম রাজাকারদের হোল্ড করতে বলেন। কিন্তু তারা না থেমে দৌড়ে পালাতে থাকলে কমান্ডার আবুল হাসেম তার এস.এম.জি দিয়ে ব্রাস ফায়ার করেন। সাথে সাথে বালিয়া রাজাকার ক্যাম্প থেকে রাজাকাররাও গুলি বর্ষণ শুরু করে। কালবিলম্ব না করে ১০৫ জন মুক্তিযোদ্ধার হাতিয়ার গর্জে ওঠে এবং আমাদের ৪টি এল.এম.জি দিয়ে অনবরত ব্রাস ফায়ার হতে থাকে। এমনিভাবে ১০মিনিট যুদ্ধের পর বালিয়া রাজাকার ক্যাম্পের গুলি বর্ষণ থেমে যায়। ৪/৫ জন রাজাকার দৌড়ে রাস্তা সংলগ্ন যে বাড়ীতে আত্মগোপন করে সে বাড়ীতে আমরা তিনজন মুক্তিযোদ্ধা হানা দেই। সামনে বীর মুক্তিযোদ্ধা নবী হোসেন, মাঝে বীরমুক্তিযোদ্ধা হাবিবুর রহমান এর শেষে আমি আব্দুর রব সিংগেল লাইনে এ বাড়ীর উঠানে যাওয়া মাত্র রাজাকারদের একজন আমাদের লক্ষ্য করে গুলি করে। লক্ষভ্রষ্ট হয়ে আমাদের কান ঘেষে গুলি চলে যায়। আমরা আল্লাহর অশেষ রহমতে বেঁচে যাই। সাথে সাথে আমরা মাটিতে শুয়ে পজিশন নিয়ে তিনজন রাজাকারকে গুলি করে হত্যা করে তাদের নিকট থেকে ৩টি থ্রি নট থ্রি রাইফেল উদ্ধার করি এরং সেখানে খোঁজ করে আর কাউকে না পেয়ে আমরা বালিয়া রাজাকার ক্যাম্পের দিকে অগসর হওয়ার জন্য অভিপ্রায় ব্যক্ত করি। কমান্ডার আবুল হাসেম বালিয়া রাজাকার ক্যাম্পের দিকে অগ্রসর না হয়ে বেক



মার্চ করতে নির্দেশ দেন। কারণ রাজাকাররা যদি এ্যাম্বুশ করে থাকে তবে আমাদের সমূহ ক্ষতির সম্ভাবনা রয়েছে। তাই আমাদের কোন ক্ষয়ক্ষতি ছাড়াই বালিয়া রাজাকার, আলবদর ক্যাম্পের রাজাকারদের নিকট থেকে উদ্বারকৃত ৩টি রাইফেল নিয়ে বেক মার্চ করে আমরা ৩ অক্টোবর ঢালু মুক্তিযোদ্ধা ক্যাম্পে ফিরে আসি। পরবর্তী সময়ে জানতে পারি, বালিয়া ক্যাম্পের রাজাকার কমান্ডার বসির মেকার এবং আলবদরের কমান্ডার মৌ: দৌলত আলী সহ সকল রাজাকাররা তাদের অস্ত্রশস্ত্র ফেলে দৌড়ে ক্যাম্প ছেড়ে পালিয়ে গিয়েছিল। আরও জানাতে পারি যে, মৃত ঐ তিন রাজাকার বালিয়া বাজারে শান্তি কমিটির মিটিং শেষে স্থানীয় শান্তি কমিটির চেয়ারম্যানকে বাড়ীতে পৌঁছে দিতে যাচ্ছিল এবং পথিমধ্যে যে বাড়ীতে রাজাকাররা আত্মগোপন করেছিল সে বাড়ীতে মুরগীর একটি খোঁয়ারে লুকিয়ে ঐ চেয়ারম্যান প্রাণে বেঁচে গিয়েছিল। নাওভাঙ্গা যুদ্ধ, খিচা রাজাকার ক্যাম্প আক্রমণ ও বালিয়া রাজাকার ক্যাম্প আক্রমণ সহ ১৩ দিনের এই গেরিলা অভিযানে ১০৫জন বীর মুক্তিযোদ্ধা নিজেদের কোন ক্ষয়ক্ষতি ছাড়াই যেভাবে অমানসিক কষ্ট করে, জীবন বাজি রেখে, বার বার শত্রুর মুখোমুখি হয়ে এবং জনগণ যেভাবে ভয়ভীতি উপেক্ষা করে মুক্তিযোদ্ধাদের আশ্রয় ও খাবার দিয়েছে এবং পথ দেখিয়েছে সে বীরত্বগাঁথা জনযুদ্ধ আমাদের আমৃত্যু স্মরণীয় হয়ে থাকবে। এ বীরত্বগাঁথা অভিযানে যারা অংশগ্রহণ করেছিলেন তারা হলেন সর্ববীর মুক্তিযোদ্ধা আবুল হাসেম, আতাউদ্দিন শাহ, নুরুল ইসলাম, হাফিজ উদ্দিন, হাবিলদার মেজবাহ্, আব্দুর রব, হযরত আলী, শাহজাহান আলী বাদশাহ্, আলাউদ্দিন, রঞ্জিত গুপ্ত, নবী হোসেন, বদিউল আলম রতন, আব্দুর রশিদ তালুকদার, সেলিম সাজ্জাদ, রবার্ট সরকার, ফারুক আহমেদ, হাবিবুর রহমান, আকবর আলী, শামসুল হক বাদল, সোহরাব আলী, শামসুল হক, ইকরাম হোসেন মানিক, চন্দ্রকিশোর সরকার, আবুল কাশেম, মঞ্জু তালুকদার, সায়েদুর রহমান, আব্দুর রহমান, আব্দুস ছোবহান, আলী আহাম্মদ দুদু, আবু তাহের, রফিকুল আলম, এম এ তাহের, অজয় কুমার ঘোষ, বিজয় চন্দ্র বিশ্বাস, দেবল চন্দ্র দত্ত, পরেশ চন্দ্র সরকার, মনোরঞ্জন দেব, হরিশংকর মজুমদার, আব্দুল কাদির, আইয়ুব আলী, গোলাম মোস্তফা চৌধুরী, হযরত মারাক, হারুন সাংমা, মোঃ ইব্রাহীম, আব্দুল বারেক সরকার, মোঃ ইসমাইল হোসেন, মোঃ মুসলিম উদ্দিন, খুদিরাম পাল, কেরামত আলী, মোঃ ইসরাইল, সুকুমার গুহ, রমজান আলী, আব্দুল মোতালেব, আব্দুল কুদ্দুস, জিয়া উদ্দিন, আমছর আলী, হাসমত আলী, হোসেন আলী, আব্দুল বারী, লোকাস সাংমা, আজীজুল হক, সুধীর চন্দ্র দাস ও আরব আলী প্রমুখ। পাকবাহিনীর ক্যাম্পে আকস্মিক আক্রমণ অক্টোবর মাসের দ্বিতীয়

সপ্তাহ। পরিকল্পনা হয় পাকহানাদার বাহিনীর ক্যাম্পে আকস্মিক আক্রমণ করে আবার নিরাপদে নিজেদের ক্যাম্পে চলে আসা। অর্থাৎ হিট এন্ড রান কৌশল অবলম্বন করা। পরিকল্পনা অনুযায়ী কমান্ডার আতাউদ্দিন শাহ এর নেতৃত্বে আমরা এক প্লাটুন মুক্তিযোদ্ধা প্রস্তুত হই। ১২ অক্টোবর সীমান্তবর্তী ´হাতিবান্দা পাকবাহিনীর ক্যাম্পে এবং ১৮ অক্টোবর সীমান্তবর্তী ফরেস্ট অফিসের পাকবাহিনীর ক্যাম্পে আমরা সন্ধ্যার পরে নিরাপদ জায়গায় পজিশন নিয়ে গুলিবর্ষণ শুরু করি। পাকসেনারও পাল্টা গুলিবর্ষণ শুরু করে। কিছুক্ষণ গোলাগুলির পর আমরা নিরাপদে নিজেদের ক্যাম্পে চলে আসি। অন্যদিকে সারারাত পাকহানাদার বাহিনী গুলিবর্ষণ চালিয়ে যায়। এই দুটি পাকবাহিনী ক্যাম্পে আমাদের আক্রমণের কৌশল ছিল পাকহানাদার বাহিনীকে ভীত ও আতঙ্কগ্রস্ত করে রাখা। এছাড়া আমরা হাসিম কোম্পানির মুক্তিযোদ্ধারা আমাদের ক্যাম্প থেকে বিভিন্ন স্থানে এ্যম্বুশ করা, প্রেট্রোলিং ডেউটি করা, এলপি ডেউটি করা, নিত্যনৈমত্তিক ঘটনা ছিল। ঐতিহাসিক তেলিখালী যুদ্ধ ঐতিহাসিক তেলিখালী যুদ্ধ মহান স্বাধীনতার মাইলফলক। ১৯৭১ সালের ৩ নভেম্বর এ ভয়াবহ সম্মুখ যুদ্ধ সংঘটিত হয়। ময়মনসিংহ সীমান্তবর্তী ভূবনকুড়া ইউনিয়নে অবস্থিত তেলিখালী পাক সীমান্ত ফাড়ি (বিওপি)। এ ফাঁড়ি ছিল পাক হানাদার বাহিনীর ৩৩ পাঞ্জাব রেজিমেন্টের একটি শক্তিশালী দুর্গ। সিদ্ধান্ত হয় তেলিখালী শত্রুমুক্ত হলে ময়মনসিংহ বিজয়ের মধ্যদিয়ে ঢাকা বিজয় সহজ হবে। পরিকল্পনা অনুযায়ী মুক্তিবাহিনী ও মিত্র বাহিনী যৌথভাবে এ যুদ্ধ জয়ের প্রস্তুতি নেয়। অক্টোবর/৭১ এর শেষ সপ্তাহে মুক্তিবাহিনী কমান্ডার আবুল হাসেম এর নেতৃত্বাধীন আমরা ২০১ জন মুক্তিযোদ্ধা বিভক্ত হয়ে মিত্রবাহিনীর ব্রিগেড কমান্ডার কর্নেল বঘুবন সিং এর নেতৃত্বাধীন রাজপুত রেজিমেন্টের ৫টি কোম্পানী, আলফা, ব্রেভো, চার্লি, ডেল্টা ও এডম (ব্যাটেলিয়ন হেড কোয়ার্টার) এর সাথে একত্রিত হই। প্রায় এক সপ্তাহ যৌথ বাহিনীর ৫টি কোম্পানীর চলে যুদ্ধ জয়ের মহড়া বা প্রস্তুতি। প্রস্তুতি শেষে শত্রুবাহিনীর ক্যাম্প তেলিখালী যথাযথভাবে রেকি করে হাইকমান্ডের নির্দেশানুযায়ী ২ নভেম্বর রাত ১২টার সময় মেঘালয়ের সীমান্তবর্তী যাত্রাকোনা স্কুল মাঠে আমরা ৫টি কোম্পানী সমবেত হই। সেখানে আনুষ্ঠানিকতা ও নির্দেশনা শেষে যৌথ বাহিনীর ৫টি কোম্পানী অত্যাধুনিক অস্ত্রেশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে তেলিখালীর ক্যাম্পের তিন দিকে অবস্থান নিয়ে নিজ নিজ অবস্থানে আমরা পজিশন নেই। ৩ নভেম্বর রাত ৩টার সময় ভেরীলাইট পিস্তল দিয়ে ফায়ারের মাধ্যমে সংকেত দেওয়ার সাথে সাথে তেলিখালীর ৩ দিক থেকে সাড়াশী আক্রমণ চালানো হয় এবং উত্তর দিক থেকে চলে কভারিং ফায়ার ও আর্টিলারী শেল



নিক্ষেপ। সাথে সাথে পাক বাহিনী ও রাজাকাররা পাল্টা গুলি বর্ষণ শুরু করে এবং বাঘাইতলি পাকবাহিনীর গোলন্দাজ ইউনিট থেকে মর্টার শেল নিক্ষেপ শুরু করে। জীবন বাজি রেখে মৃত্যুর মুখোমুখি হয়ে যৌথবাহিনীর বীর যোদ্ধারা ক্রোলিং করে একের পর এক পাক বাংকারে জয়বাংলা ধ্বনি দিয়ে গ্রেনেড চার্জ শুরু করি। চলে মরণপন তুমুলযুদ্ধ। উভয়পক্ষের বিভিন্ন ক্ষমতা সম্পন্ন মর্টার, রকেট লাঞ্চার, বিভিন্ন প্রকার মেশিনগানের ব্রাশ ফায়ার, স্বয়ংক্রিয় রাইফেলের গুলি এবং গ্রেনেড বিস্ফোরনের শব্দে আকাশ বাতাস প্রকম্পিত হয়ে উঠে। প্রায় দীর্ঘ ৪ ঘন্টা ধরে চলে এ ভয়াবহ যুদ্ধ। এক শ্বাসরুদ্ধকর রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মধ্যদিয়ে সকল ৭টার সময় পাকহানাদার বাহিনীর কবল থেকে তেলিখালী মুক্ত হয়। এ যুদ্ধে ১২৪ জন পাকসেনা, ৮৫ জন রাজাকার ও রেঞ্জার (সর্বমোট ২০৯ জন) প্রাণ হারায়। আহত অবস্থায় ১ জন পাকসেনা ও ২ জন রাজাকার আত্মসমর্পন করে। বহু অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদ যৌথ বাহিনী হস্তগত হয়। একজন শত্রুসৈন্যও ক্যাম্প থেকে পালাতে পারেনি এবং পাকবাহিনীর একটি লাশও নিয়ে যেতে পারেনি। যুদ্ধজয়ের পর তেলিখালীতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা অসংখ্য মৃত পাকসেনা ও রাজাকারের ছিন্নবিচ্ছিন্ন লাশের সাথে দুইজন মহিলার লাশও দেখা যায়। পরবর্তী সময়ে জানা যায় নালিতাবাড়ীর আলবদরের কমান্ডার আব্দুর রহমান উক্ত মহিলাদ্বয় কে ধরে পাকসেনাদের হাতে তুলে দিয়েছিল। তেলিখালী যুদ্ধজয়ের ফলশ্রুতিতে ময়মনসিংহ অঞ্চলে পাকবাহিনীর রক্ষণভাগ সম্পূর্ণরূপে ভেঙ্গে পড়ে এবং আমাদের ময়মনসিংহ বিজয়সহ চুড়ান্ত বিজয়ের পথ প্রশস্ত হয়। তেলিখালী শত্রুমুক্ত করতে বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করে ৮জন বীর মুক্তিযোদ্ধা এবং ২১ জন মিত্রবাহিনীর বীরসেনা শাহাদাৎ বরণ করেন। এ যুদ্ধে যে ৮ জন বীর মুক্তিযোদ্ধা শহীদ হন তারা হলেন– হালুয়াঘাটের তেলিখালী গ্রামের বীর মুক্তিযোদ্ধা আক্তার হোসেন সরকার, ফুলপুরের ভাইটকান্দি গ্রামের বীর মুক্তিযোদ্ধা হযরত আলী, ময়মনসিংহ শহরে বাঘমারার বীর মুক্তিযোদ্ধা শাহজাহান আলী বাদশা, কৃষ্টপুরের বীর মুক্তিযোদ্ধা আলাউদ্দিন, সদর উপজেলার বেগুনবাড়ীর বীর মুক্তিযোদ্ধা রঞ্জিত গুপ্ত, লালিতাবাড়ী উপজেলার কালাকুমা গ্রামের বীর মুক্তিযোদ্ধা ইদ্রিস আলী, নোয়াখালী জেলার বাসিন্দা ইপিআর এর সদস্য বীর মুক্তিযোদ্ধা ওয়াজিউল্লাহ, এবং বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র জামালপুর সরিষাবাড়ীর বীর মুক্তিযোদ্ধা শওকত উসমান। এ যুদ্ধ জয়ের পর কমান্ডার আবুল হাসেম ও কমান্ডার আতাউদ্দিন শাহ এর নেতৃত্বে শত্রুমুক্ত তেলিখালী সীমান্ত ফাড়ির পিছনে ৭ জন বীর মুক্তিযোদ্ধার লাশ সমাহিত করা হয় এবং বীর মুক্তিযোদ্ধা শাহজাহান আলী বাদশার লাশ তেলিখালী হতে নিয়ে গিয়ে ঢালু যুব শিবিরের প্রধান বীর মুক্তিযোদ্ধা

অধ্যক্ষ মতিউর রহমানে নেতৃত্বে ঢালুতে কবর দেয়া হয়। তেলিখালী যুদ্ধে শহীদ ২১ জন মিত্রবাহিনীর বীর সেনাদের শেষকৃত্য অনুষ্ঠান ১৩ রাজপুত রেজিমেন্টের তৎকালীন ব্যাটালিয়ান হেডকোয়াটারে অনুষ্ঠিত হয়। এ শেষকৃত্য অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ভারতীয় সেনাবাহিনীর পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ডার লেঃ জেনারেল জগজিৎ সিং অরুরা, ব্রিগেডিয়ার সান্তসিং বাবাজি, কর্নেল রঘুবন সিং সহ মিত্র বাহিনীর উচ্চপদস্থ অফিসারবৃন্দ এবং মুক্তিবাহিনীর কমান্ডার আবুল হাসেম এবং এডম গ্রুপ কমান্ডার হিসেবে আমি আব্দুর রব ও টুআইসি নবী হোসেন। সেই হৃদয়বিদারক দৃশ্য আজও ভুলি নি। ঐতিহাসিক তেলিখালী যুদ্ধে মুক্তিবাহিনীর পক্ষে নেতৃত্ব দেন কমান্ডার আবুল হাসেম ও মিত্র বাহিনীর পক্ষে নেতৃত্বে দেন কর্নেল রঘুবন সিং। মুক্তিবাহিনীর পক্ষে আলফা প্লাটুনে নেতৃত্ব দেন কমান্ডার নুরুল ইসলাম, ব্রেভো প্লাটুনে নেতৃত্ব দেন কমান্ডার আতাউদ্দিন শাহ, চার্লি প্লাটুনে নেতৃত্ব দেন কমান্ডার হাফিজ উদ্দিন, ডেল্টা প্লাটুনে নেতৃত্ব দেন কমান্ডার হাবিলদার মেজবাহ্ এবং এডম প্লাটুনে নেতৃত্ব দেই আমি আব্দুর রব। তেলিখালী যুদ্ধে আরও ৬টি কাটঅফ পার্টিতে বিভিন্ন কোম্পানীর বীর মুক্তিযোদ্ধাগন অংশগ্রহণ করেন। তাছাড়া তেলিখালী সম্মুখ যুদ্ধে জীবন বাজি রেখে বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করে তেলিখালী শত্রুমুক্ত করে গাজী হয়ে ফিরেছেন তাদের মধ্যে সর্ববীর মুক্তিযোদ্ধা আবুল হাসেম, আতাউদ্দিন শাহ্, নুরুল ইসলাম, হাবিলদার মেজবাহ্, হাফিজ উদ্দিন, আব্দুর রব, নবী হোসেন, বদিউল আলম রতন, আব্দুর রশিদ তালুকদার, সেলিম সাজ্জাদ, বিমল পাল, রবার্ট সরকার, ফারুখ আহমেদ, হাবিবুর রহমান, আকবর আলী, শামছুল হক বাদল, সোহরাব আলী, শামছুল হক, ইকরাম হোসেন মানিক, চন্দ্র কিশোর সরকার, আবুল কাশেম, মঞ্জু তালুকদার, সৈয়দ আলী, আব্দুস সামাদ, আব্দুর রউফ, নজরুল ইসলাম, শরাফ উদ্দিন, জামাল উদ্দিন, সায়েদুর রহমান, আব্দুর রহমান, আব্দুস ছোবহান, আলী আহাম্মদ দুদু, আবু তাহের, রফিকুল আলম, এম,এ তাহের, অজয় কুমার ঘোষ, বিজয় চন্দ্র বিশ্বাস, দেবল চন্দ্র দত্ত, পরেশ চন্দ্র সরকার, মনোরঞ্জন দেব, হরিশংকর মজুমদার, আব্দুল কাদির, আইয়ুব আলী, গোলাম মোস্তফা চৌধুরী , হযরত মারাক, হারন সাংমা, মোঃ ইব্রাহিম, খুদিরাম পাল, কেরামত আলী, মোঃ ইসরাইল, সুকুমার গুহ, রমজান আলী, আব্দুল মোতালেব, আব্দুল কুদ্দুছ, জিয়াউদ্দিন, আমছর আলী, হাসমত আলী, হোসেন আলী, আব্দুল বারি, লোকাশ সাংমা, আজিজুল হক, সুধীর চন্দ্র দাস, আরব আলী, আফাজউদ্দীন, প্রাণেশ চন্দ্র প্রমুখ। মহান মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে সর্বপ্রথম শত্রুমুক্ত হয় তেলিখালী। ঐতিহাসিক তেলিখালী যুদ্ধ ময়মনসিংহ জেলার একটি রক্তক্ষয়ী সম্মুখযুদ্ধ ও সফলযুদ্ধ এবং



মহান স্বাধীনতার মাইলফলক। ঐতিহাসিক তেলিখালী যুদ্ধে যৌথ বাহিনীর যে সকল বীর সেনারা রক্ত দিয়ে ও মৃত্যুকে উপেক্ষা করে বাংলাদেশের স্বাধীনতা এনে দিয়েছেন তাদের রক্ত ও ত্যাগের ঋণ দেশ কোনদিন শোধ করতে পারবে না। ঐতিহাসিক তেলিখালী যুদ্ধের বীরত্বগাঁথা প্রজন্মের নিকট তুলে ধরাও আমাদের নৈতিক দায়িত্ব। তাদেরকে বিভিন্ন খেতাবে ভূষিত করাও সময়ের দাবী। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে তেলিখালী যুদ্ধ আমার শেষ যুদ্ধ। তবে তেলিখালী পুনরায় দখলে নেয়ার জন্য পাকসেনাদের হীনপ্রচেষ্টা আমরা বারবার ব্যর্থ করে দিয়েছি। হালুয়াঘাট শত্রুমুক্ত না হওয়া পর্যন্ত আমরা তেলিখালী এলাকা মুক্ত রেখেছি। পরবর্তী সময়ে যৌথবাহিনীর আক্রমণে পাকবাহিনী ও রাজাকাররা পালাতে থাকে। ১০ ডিসেম্বর মুক্ত ময়মনসিংহে প্রবেশ করে টিচার্স ট্রেনিং কলেজে ক্যাম্প স্থাপন করি। সেখানে প্রায় দুই মাস অবস্থান করার পর জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নির্দেশেই অস্ত্র জমা দিয়ে নিজ গৃহে প্রত্যাবর্তন করি। ১৯৭১ সালের স্বশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ আমার অহংকার। আমি স্বশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের আলোকে বলবো যে, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব, মুক্তিযুদ্ধ ও মুক্তিযোদ্ধা এক সূত্রে গাঁথা। তা অভিন্ন ও অবিচ্ছেদ্য।

## যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধা মো. আহসান আলী খান

**নাজিরাকোনা, বাগোয়ান, মুজিবনগর, মেহেরপুর**

আমি সিনিয়র ওয়ারেন্ট অফিসার হাজী মো. আহসান আলী খান (অবঃ) যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা। ১৯৭১ সালে পাকিস্তান আর্মিতে কোর অব ইঞ্জিনিয়ারে নবীন সৈনিক হিসাবে চট্টগ্রাম সেনানিবাসে, হোল্ডিং কোম্পানিতে ছিলাম। আমার হোল্ডিং নাম্বার ৪৬১৫, আমরা ৭৫ জন ছিলাম (ইঞ্জিনিয়ার, আর্টিলারী, আরমাড, সিগনাল ও এমওডিসি) প্রতিদিন রুটিন অনুসারে সকল কাজে অংশগ্রহণ করতাম। হোল্ডিং কোম্পানির হাবিলদার মেজর ছিল নুর মহাম্মদ (পাঞ্জাবী), প্লাটুন ও সেকশন কমান্ডার ছিল নায়েক রমজান আলী (পাঠান), নায়েক আনারগুল (পাঠান), ল্যান্স নায়েক আব্দুল মালেক (বাঙ্গালী) দেশের অবস্থা ভালো না,সব সময় হরতাল কারফিউ থাকতো। সেনানিবাসে থাকলেও বাহিরের সংবাদ সব সময় রাখতাম। চট্টগ্রাম সেনানিবাসের দক্ষিণ পাশে বায়েজিদ বোস্তামী মাজার ও বাজার। আমি জাফর (ফরিদপুর), হারুন (কুমিল্লা), আজিজ (বগুড়া) ও আলী আহম্মেদ (নোয়াখালী) একই সাথে থাকতাম। বাঙ্গালী ওস্তাদ মালেক প্রায় বলতেন দেশের অবস্থা ভালো না তাই আগামী ৭ই মার্চ ১৯৭১ ইং তারিখ রোজ রবিবার রেসকোর্স ময়দানে বিশাল জনতার মাঝে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান জাতীর উদ্দেশে ভাষণ দেবে। বঙ্গবন্ধুর ভাষণ শোনার জন্য অপেক্ষা করি। আমরা বাঙ্গালী সৈনিকরা বেশ বুঝতে পারতাম যে, পশ্চিম পাকিস্তানি সৈন্যরা আমাদের সাথে ভালো আচরণ করতো না। প্রায় সময় গন্ডোগোল হতো, এমনকি হাতাহাতি পর্যন্ত হত। প্রায় সময় এর জন্য সাজা ভোগ করতাম। বাঙ্গালিদের প্যাক ০৮ সবসময় ইট অথবা বালি ভরা থাকতো। আমাদের ব্যারাকটি ছিল একদম পাহাড় ঘেষা। পাশেই বড় ড্রেন ও কুয়া এবং একপাশে ফ্যামিলি কোয়াটার। নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য দরকার হলে ইবিআরসি অথবা সিনেমা হল ক্যান্টিনে যেতে হত। লাইন এলাকা থেকে বাহির হতে হলে আমাদের জন্য গেইট পাস দরকার হতো। কিন্তু ওদের কিছুই লাগতো না। ৭ই মার্চ রবিবার সকাল হতে পুরো সেনানিবাস জুড়ে কেমন একটা থমথমে ভাব। হঠাৎ নির্দেশ জারি হয় যে, কোন বাঙ্গালি রেডিও বা টেলিভিশন শুনবে না। সৈনিক লাইনে কারো রেডিও থাকার কথা না তবুও জোর করে সকলের কাববোর্ড চেক করা হল। আমরা বিকাল আড়াইটার দিকে লুকিয়ে ইবিআরসি এর ক্যান্টিনে গিয়ে, জানতে পারলাম টেলিভিশন চালানো বন্ধ। চট্টগ্রাম রেডিও বঙ্গবন্ধুর ভাষণ ঢাকা রেডিও হতে রিলে করে শুনাবে। আমরা রেডিও শুনার জন্য অপেক্ষায়ই



থাকলাম। রেডিওতে গানের মাঝে মাঝে কিছুক্ষনের মধ্যেই বঙ্গবন্ধু ভাষণ দেবেন। কিন্তু হঠাৎ গান বাজতে বাজতে রেডিও বন্ধ হয়ে গেল। ব্যারাকে ফেরত আসার পথে আরপি চেক পোস্টে আমাদের আটকে দেয়। এর জন্য হাবিলদার মেজর সাজা দেয়। রাতে বি বি সি ও আকাশ বানী কলকাতা হতে ঘোষণা দেয় পাক সরকার বঙ্গবন্ধুর ভাষণ শোনানোর জন্য রাজি হয়েছে। আগামী ৮ই মার্চ সকাল ০৮:৩০ ঘটিকার সময় ভাষণ প্রচার করা হবে। ভাষণ শোনার জন্য আমরা বাঙ্গালীরা অপেক্ষা করছিলাম। আল্লাহর মেহেরবানীতে আমরা বাঙ্গালী ও পাকিস্তানি সৈনিক মিলে ৫০ জন ই বি আর সি গ্যারিসন মসজিদ এলাকায় মাটি কাটার কাজে যাই। কাজের মাঝে বায়েজিদ বোস্তামি বাজার হতে মাইকে ঘোষণা দেয় যে এখন বঙ্গবন্ধু ভাষণ দেবেন। ভাষণ শুরু হলে আমরা বাঙ্গালীরা কাজ বন্ধ করে দাড়িয়ে যাই।এমন সময় ওস্তাদ আনারগুল তেড়ে আসে। যখন বঙ্গবন্ধু বলেন যে "এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম, যার যা আছে তাই নিয়ে ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোলো" তখন আমরা সবাই এক সাথে গেতি বেলচা উঠিয়ে "জয় বাংলা" বলে স্লোগান দিই। পাঞ্জাবী ওস্তাদ যারা ছিল সবাই তেড়ে আসে এবং উর্দুতে বলে "তুম লোক শেখ বনগিয়া, জয় বাংলা মাত বলো পাকিস্তান জিন্দাবাদ বাতাও, তুম লোক হুসমে আজাও" কাজের শেষে ব্যারাকে আসার পর দেখি যত পাঞ্জাবী সৈনিক ছিল সকলে যেন আমাদের নতুন ভাবে দেখছে। বুঝতে পারলাম যে তাদের কাছে অপরাধী। ৭ই মার্চ ভাষণের পর হতে আমরা নতুন জীবনের খোঁজ পাই। যে সকল বাঙ্গালী সৈনিকরা ফ্যামিলিসহ সেনানিবাসের বাহিরে বসবাস করতেন তারা সেনানিবাসে এসে বলে যে বাহিরের অবস্থা মোটেও ভালো না। টাইগার পাস, নিউমার্কেট সহ শহরের বিভিন্ন এলাকায় বাঙ্গালীরা কারফিউ না মেনে মিছিল সমাবেশ করছে। পাঞ্জাবীরা তাদের উপর গুলি বর্ষণ করে, অনেক বাঙ্গালীদের তারা মেরে ফেলে। এই অবস্থায় আমাদের করার কিছুই ছিল না। কারণ বাঙ্গালী সৈনিকরা বাহিরে ডিউটিতে যেতে পারতো না। ২৩ ই মার্চ হঠাৎ তিনটি হেলিকাপ্টার ইবিআরসি ট্রেনিং গ্রাউন্ডে নামে। পরে জানতে পারি যে, ইবিআরসি সেন্টার কমান্ডার ব্রিগেডিয়ার মজুমদারকে এরেস্ট করে ঢাকাতে নেওয়া হয়। ২৫শে মার্চ সেনানিবাসের সব উঁচু পাহাড়ের উপর ভারি অস্ত্র বসানো হয়। প্রতিটি অস্ত্রের লক্ষবস্তু ছিল ই বি আর সি ট্রেনিংরত বাঙ্গালী সৈনিক ব্যারাক, হোল্ডিং কোম্পানির ও ফ্যামিলি কোয়াটার এর দিকে। অবস্থা দেখে আমাদের দম বন্ধ হওয়ার পথে। সকল গেইট বন্ধ। তখন আমরা আল্লাহকে স্মরণ করছি। আমরা বাঙ্গালীরা মনে মনে চিন্তা করলাম যে সুযোগ পেলে ব্যারাক ছেড়ে পাহাড়ের ঐপারে চলে যাবো। ২৫শে মার্চ সন্ধ্যা বেলা রোল কল প্যারেডে

রেজিস্টার অনুযায়ী নাম ডাকা হয়। সকল সৈনিক উপস্থিত হওয়াতে কোন প্রকার সমস্যা হয় নাই। সিএইচএম প্রতিদিনের ন্যায় অর্ডার শুনাই। হঠাৎ কোম্পানী কমান্ডার ক্যাপ্টেন সুবিদ আলী ভূঁইয়া প্যারেডে উপস্থিত হওয়ায় সিএইচএম একটু ঘাবড়ে যায়। কোম্পানি কমান্ডারকে প্যারেড হ্যান্ডওভার করার পর একপাশে সরে দাড়াই। ক্যাপ্টেন সুবিদ আলী ভূইয়া সকলের মনের অবস্থা জানতে চায়। আমরা একসাথে আওয়াজ করে বলি যে, "ভালো আছি স্যার"। তিনি বলেন যে "খুব মন দিয়ে শুনবে গত ৭ই মার্চ হতে আমরা বাঙালিরা কিন্তু সব চোখে চোখে আছি। সেনানিবাসের সব উঁচু পাহাড়ে ভারি অস্ত্র লে আউট আছে, অতএব সতর্ক থাকবে, খোদা হাফেজ"। এবং প্যারেড শেষ করার আদেশ দিয়ে চলে যান। পরে সি এইচ এম বেশ কড়া ভাষায় বলে যে, "ক্যাপ্টেন সাব যো কুছ বাতাইয়া মুঝে মালুম নেহি, মেরি বাথ ধ্যানসে শুনলো প্যারেড খতমছে কোই আদমি বাহার নেহি জাওগি, আপনা বেডপর যা কর আরাম কর গি, আপনা কামরামে কোই বাতি নেহি জালেগি, মেরি বাথ বর খেলাপ হোনেসে সারেকো বহুত সাজা মিলেগি"। আমরা লক্ষ করি যে সিএইচএম এর চোখে মুখে কেমন যেন ভয়ের ছাপ ফুটে উঠে। প্যারেড শেষে যে যার রুমে চলে যাই। বার বার ভূইয়া সাহেবের কথা মনে পরছিল। ভারি অস্ত্রের কথা কি বুঝাতে চেয়েছিল! অন্যদিন আমাদের সৈনিক লাইনে বাঙ্গালী পাঞ্জাবী মিলে ডিউটি পড়তো, কিন্তু আজ উল্টো। রাত আনুমানিক এগারোটার দিকে দেখি যে, সিএইচএম ও লাইন ডিউটির পাঞ্জাবী সৈনিকরা অস্ত্র হতে ডিউটি করছে। আমরা কিন্তু তখন কোন কিছুই অনুভব করতে পারি না ,শুধু মনে হচ্ছিলো বাঙ্গালী সৈনিকদের বাদ দিয়ে এসব করার কারণ কি? একসময় বুঝতে পারলাম যে লাইন ডিউটি প্রহরি বাহির হতে সব দরজার সিটকিনি আটকিয়ে দেয়। তখন মোটামুটি বন্দি বলে সবাই ধরে নিলাম আমরা।কিছুক্ষণ পরে ইলেকট্রিক মেইন সুইচ অফ হয়ে যায়। তখন মনে হয় এবার বুঝি আমাদের উপর কোন বিপদ নেমে আসবে। ২৫ শে মার্চ রাত বারোটা বাজার কয়েক সেকেন্ড পরই, ইবিআরসি কোয়াটার গার্ড রুম হতে হোল্ড হ্যান্ডস আপ আওয়াজ আসে এবং সাথে সাথে গুলির আওয়াজ আসে। তখন "বাবাগো মাগো চিৎকার" করে উঠে বাঙ্গালীরা। পাহাড়ের উপর রাখা অস্ত্রগুলোর ফায়ার শুরু হয়। তখন আমরা ঝটপট যার যার রুমের পিছনের জানালার কাচ ভেঙ্গে গ্রিল টেনে বাঁকা করে রুম হতে বাহির হয়ে মৃত্যুকে ভয় না করে গোলাগুলির ভিতরেই পাহাড়ের ঐপারে চলে যাই। তখন সি এইচ এম নুর মোহাম্মদ চিৎকার করে বলে "ইন্ডিয়ানে এটাককিয়া শের মাত উঠাও, সো জাও"। পাহাড় এর উপর হতে যতদুর নজর যায় বন্দুকের ব্যারেলের আগুনের ফুলকি আর ফুলকি। আমাদের



ব্যারাক সহ সব বাঙ্গালী ব্যারাকগুলি আগুন ধরে যায়, ধারণা করি যে যারা বাহির হতে পারে নাই সবাই পুড়ে মারা গেছে। ব্যারাক হতে বাহির হওয়ার সময় আমর পরনে হাফ প্যান্ট ও গেঞ্জি পরা খালি পায়ে পাহাড়ের নিচে একটু আড়ে সবাই একত্রিত হয়। ওস্তাদ মালেক একটা হিসাব করে হোল্ডিং কোম্পানির অর্ধেক বাহির হতে পারেনি। মর্টার গোলা পাহাড় এর মধ্যে পড়তে শুরু করে। আমর অন্ধকারে পাহাড় এর কোন দিকে যাচ্ছি বুঝতে পারছিলাম না। অনেক দূর হতে ফজরের আযান শোনা যাচ্ছিলো। রাস্তায় অনেক ইবিআরসি অনেক বাঙ্গালি আহত সৈনিকদের সাথে দেখা হয়। অনেকেই আহত, শরীর থেকে রক্ত ঝরছে। পাহাড়ী কাঁটা, লতা-পাতায় আমাদের শরীর ক্ষতবিক্ষত হয়। আযানের পরেই মাইকে প্রচার হয় যে, সেনানিবাস হতে যে সকল বাঙ্গালী সৈনিক ভাইরা বাহির হয়ে পাহাড় এর ভিতর পথ হারিয়ে ঘোরাঘুরি করছেন সবাই ভাটিয়ারী দিকে চলে আসেন। ২৬শে মার্চ পূর্ব আকাশ পরিষ্কার হলে দিক ঠিক করে হাটা শুরু করি। রাস্তায় আওয়ামী লীগ এর উদ্ধার কর্মীর সাহায্যে সমতাল ভূমিতে আসি। সেখানে প্রথমিক চিকিৎসা ব্যাবস্থা থাকায় আমরা প্রাথমিক চিকিৎসা নেই। উপস্থিত আওয়ামী লীগ নেতা কর্মীরা যথেষ্ট সাহায্য করে এবং বলে যে, আপনারা আল্লাহর মেহেরবানীতে মৃত্যুর হাত থেকে ফেরত এসেছেন। তখনো পাক বাহিনী সেনানিবাস এলাকা হতে বাহির হয়ে অন্য জাইগায় যায়নি। জানতে পারলাম অপারেশন সার্চ লাইট ঘোষণা করে সারাদেশে নিরস্ত্র জনগণকে হত্যা করেছে। পরবর্তী নির্দেশের অপেক্ষায় আমি, জাফর ও আজিজ সহ ভাটিয়ারী বাজার থেকে সাগরের দিকে একটা পুকুর পাড়ে যাই। উভয়ের মধ্যে আলোচনা করি দেশের যে অবস্থা আমরা দেশের বাড়ি যেতে পারবো না, তাই সিদ্ধান্ত নেই যে, দেশ স্বাধীন না হওয়া পর্যন্ত আমরা বাড়ি যাবো না। পাড়ার লোকজন জানতে চায়, আপনারা কিভাবে সেনানিবাস হতে বাহিরে আসলেন? যারা আসতে পারে নাই তাদের কি অবস্থা? আমরা যতটুকু জানি যে, বাঙ্গালীদের ব্যারাকগুলোতে গুলি করে ঘুমন্ত অবস্থাই মেরে ফেলে। হঠাৎ মাইকে ঘোষণা হয় যে, যে সকল সৈনিক ভাইয়েরা সেনানিবাস হতে এসেছেন সবাই রাস্তার পাশে অপেক্ষা করেন। আওয়ামী লীগের সংগ্রাম কমিটির সদস্যরা বাস ট্রাক নিয়ে সকলকে একত্র করার ব্যাবস্থা নিয়েছে। মনে অনেক সাহস পেলাম। এমন সময় একটি দশ বারো বছরের ছেলে ছুটে আসে এবং বলে "কাকু আপনাদের সারাদিন খাওয়া হয়নাই, আমরা হিন্দু যদি ইচ্ছা করেন আসেন আমাদের বাড়িতে খাবেন"। সত্যি বলতে কি সারাদিন না খাওয়া, ভাত সামনে পেয়ে আনন্দে চোখ বেয়ে পানি পড়ে এবং আত্মীয় স্বজন এর চেহারা ভেসে ওঠে। খাওয়ার পর রাস্তার ধারে আসি, বাংলাদেশ এর মানচিত্র

খচিত পতাকা লাগানো তিনটি মানুষ ভর্তি ট্রাক আসে। ট্রাকে উঠে বসার পর কোথায় যে গেলাম আমি জানি না। মাইক এ ঘোষণা আসে যে, কুমিল্লা সেনানিবাস হতে পাক আর্মি আসছে চিটাগাং ধ্বংস করার জন্য। ২৬শে মার্চ শুক্রবার বিকালে ক্যাপ্টেন সুবিদ আলী ভূইয়ার নেতৃত্বে কুমিল্লা টিবি হাসপাতালে যাই। সেখানে তিনি ব্রিফিং দেয় যে, কুমিল্লা সেনানিবাস হতে ৫৩ ব্রিগেড কমান্ডার ব্রিগেডিয়ার ইকাবাল সফি মুভ করেছে সাথে আছে ২৪ ফ্রন্টিয়ার ইঞ্জিনিয়ার ডিটাচমেন্ট, ৮৮ মর্টার ব্যাটারী সাথে আসছে। পাকিস্তানি বাহিনীকে বাধা দেওয়ার জন্য ক্যাপ্টেন সুবিদের অধিনে কুমিল্লায় ফাঁদ পাতা হয়। স্থানীয় জনগণ, সেনাবাহিনী সদস্য, ই পি আর, পুলিশ, ছাত্রজনতা, নিয়ে বাম দিকে সমুদ্র ডানদিকে পাহাড় ও ঘন গাছ, মাঝখানে চট্টগ্রাম এর রাস্তা। নিয়মিত বাহিনীর সংখ্যা ছিল মাত্র ১০০ জন। জনগণ ছিল কয়েক শত। অপেক্ষায় থাকি সন্ধ্যা ৭ ঘটিকার দিকে পাক আর্মির কনভয় আমাদের ফাঁদ এলাকায় আসে। তারা গাড়ি থেকে নেমে রাস্তার ব্যারিকেট সরাতে থাকে। আমাদের ফায়ার রেঞ্জে আসলেই ফায়ার শুরু করি। তারা এদিক ওদিক পালানোর চেষ্টা করে। যেদিকে যায় সেইদিকেই জনগণ এর কাছে বাধা পায় এবং যার কাছে যা ছিলো তাই দিয়ে আঘাত করে। শেষে পাক বাহিনী পালাতে বাধ্য হয়। পাক বাহিনীর প্রায় ১৫০ জন মারা যায়। আমাদের শহীদ হয় ১৪ জন। বিরাট এই শক্তিশালী বাহিনীর বিরুদ্ধে এই প্রতিরোধ ব্যবস্থা নেওয়া সম্ভব হয়েছিল এই কারণে যে আমাদের মনে ছিল ক্ষোভ ও আবেগ। আপারেশন শেষে আমরা গাড়িতে চট্টগ্রামের দিকে যাই এবং হাজী ক্যাম্পে বাকি রাতটুকু কাটাই। সারারাত বিভিন্ন প্রকার অস্ত্রের ফায়ারের শব্দ আসে। সকাল বেলা হাজী ক্যাম্পে একজন বিহারীকে পাওয়া যায়। পাবলিক তাকে পিটিয়ে মেরে ফেলে। ২৭শে মার্চ সকালে ক্যাপ্টেন রফিকুল ইসলাম ইপিআর (সাবেক স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী) নিজের পরিচয় দিয়ে সবার সাথে কথা বলেন। তিনি বলেন যে, জাতি আজ বিপদের মধ্যে। পাক বাহিনী আপারেশন সার্চ লাইট ঘোষণা দিয়ে নিরস্ত্র জনগণের উপর আক্রমণ করে। আপনারা এখানে যারা আছেন সবার বাড়ি নিশ্চয়ই নদীর ওপারে। গতকালের প্রতিরোধ আমাদের মনে অনেক সাহস যুগিয়েছে,আমরা কোন অস্ত্র নিয়ে আসতে পারি নাই। ই পি আর এর কিছু অস্ত্র আছে তাই দিয়ে আমাদের পাক বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়তে হবে। আমাদের কয়েকটি প্লাটুনে ভাগ করা হয়। আমি ১নং প্লাটুনে পড়ি। অস্ত্র সংগ্রহ করার পর গাড়িতে করে সিতাকুন্ডে আসি। ১নং প্লাটুনের ৩নং সেকশন আমি, জাফর, আজিজ ও আরো সাত জন ছিলাম। আমরা রেললাইন ছেড়ে সাগরের কিনারা দিয়ে হাটা শুরু করি এবং হঠাৎ ফায়ারের আওয়াজ শুনি, দেখি



যে চারিকদিকে জনগণ ছুটাছুটি করছে। সেই সাথে আমরাও সাগরের দিকে দৌড়ে পানির কিনারায় আসি এবং হাত দিয়ে বালি সরিয়ে গর্ত করে পজিশনে যাই। কিছুক্ষন পরেই জোয়ার শুরু হলে পানির ধাক্কায় কিনারের দিকে ভেসে কিনারার দিকে যাই। ভাসতে ভাসতে অনেক দূর যাই এবং কতক্ষণ এই অবস্থা ছিলাম বলতে পারবো না। চরে মরা গাছে আটকানো অবস্থায় গ্রামের লোকজন আমাদের সাহায্য করে। রাতে একটা প্রাইমারী স্কুলে আমরা অবস্থান করি। ২৮শে মার্চ গাড়ীতে অস্ত্রসহ মিরশরাই চেকপোস্টে আসলে আর্মি ও পুলিশের কিছু সদস্য আমাদের গাড়ি থেকে নামিয়ে রাখে এবং রেজিস্টারে নাম লেখায়। অল্প সময়ে অনেক সৈনিক উপস্থিত হয়। ঘোষণা হয় যে, শুভপুর ব্রিজ মুক্ত করার জন্য, আমাদের করেরহাট দারোগা বাজার পাঠানো হয়। সেখানে সেনা, পুলিশ, মুজাহিদ, ছাত্র, ই পি আর ও সাধারণ জনগণ একত্রিত হয়। ক্যাপ্টেন সুবিদ আলী ভূইয়া সংক্ষিপ্ত ব্রিফিং এ বলেন যে, আজ বিকাল ৩ ঘটিকার সময় ই পিআর এর মর্টার প্লাটুন হতে ফেনীর দিকে শুভপুর ব্রিজে এক রাউন্ড গোলা ফায়ার করা হবে। তখন সবাই আল্লাহ আকবর, জয় বাংলা বলে ফায়ার করতে করতে উপরের দিকে অগ্রসর হবে। আমরা ব্রিজের দারগা বাজার সাইডে সুবেদার মেজর ফকর উদ্দিন ই পি আর এর নির্দেশ অনুযায়ী পজিশন নেই। যথা সময়ে মর্টার এর এক রাউন্ড গোলা ফায়ার হয়। সাথে সাথে আল্লাহ আকবর ও জয় বাংলা আওয়াজ দিয়ে ফায়ার করতে করতে সামনে অগ্রসর হই। পাক সেনারা ব্রিজের এভাটমেন্ট এ পজিশন এবং আমরা নিচে পজিশন নেই । শত্রুর গুলি কানের পাশ দিয়ে মাথার চুল টাচ করে শো শো করে চলে যায়। আল্লাহ এর ইচ্ছাই শরীরে লাগে নাই। আল্লাহ যেন গুলির গতি অন্য দিকে ঘুরিয়ে দেন। মৃত্যু, বড়ই ভয়ংকর খুব কাছে থেকে দেখেছি, অনুভব করেছি, সব যুদ্ধই ছিল ভয়াবহ। সময় না হলে মৃত্যু হয় না। এই যুদ্ধে পাক হানাদার বাহিনীর ৭ জন ধরা পড়ে। জনগণ তাদের পিটিয়ে মেরে ফেলে। আমাদের দুই জন মারা যায়।তারা হলেন নায়েক হাসেম ই পি আর ও লুৎফর ই পি আর। তাদের করের হাট বাজারে করব দেওয়া হয়। সন্ধ্যায় সবাই করের হাট স্কুলের মাঠে (দারোগা বাজার ও রামগড় রাস্তার মাঝে) একত্রিত হয়। রাতে খাবার পর সুবিদ আলী ভূইয়া লেন যে, এই স্থান নিরাপদ না। যেকোন সময় আক্রমণ হতে পারে তাই আমরা রাতটুকু অন্য জায়গায় কাটাবো। আমরা কয়েকজন একটা ট্রাকে করে রামগড় রোডে গেলাম। যাওয়ার কিছুক্ষণ পরেই ই পি আর চেকপোস্টে গাড়ি থামায় এবং বলে যে, সামনে আর গাড়ি যাবে না। সবাই গাড়ি থেকে নেমে পড়ি এবং বাকি রাত ওই ক্যাম্পেই থাকি। রামগড় ই পি আর ক্যাম্প কমান্ডার ওয়ারলেস এর মাধ্যমে সিনিয়রকে আমাদের কথা

জানায় পরবর্তী আদেশ এর জন্য। ২৯ মার্চ সকালের নাস্তার পর পরই করের হাটের দিক হতে ৭/৮ টা চাঁদের গাড়ী আসে।ওই গাড়ীতে আমরা বসি। লেঃ অলি আহমেদ এর নির্দেশে রামগড় চা বাগানে কিছুক্ষণ গাড়ী অপেক্ষা করার পর রামগড় থানা মাঠে এসে থামে। ওইখানে সমস্ত সৈনিক ফলিন হই। তালিকা সহ অস্ত্র গোলাবারুদের হিসাব করা হয়। মোট জনবলকে তিনটি প্লাটুনে ভাগ করা হয়। আমি ১ নং প্লাটুনে পড়ি। প্লাটুন কমান্ডার ছিল বাহাদুর। আমাদের সেকশনের ডিউটি পড়ে রামগড় হতে হেকো, কয়লা শহীদ বাজার, দাত মারা বাজার পর্যন্ত। গাড়িতে করে টহল দেই। যে সকল জনগণ বাড়ি ঘর ছেড়ে নিরাপদ স্থানে যাওয়ার জন্য তাদের মালামাল যেন সন্ত্রাসীরা কেড়ে নিতে না পারে তার জন্য আমরা ডিউটি করতাম। আমি ওই সেকশনে টু আই সির দায়িত্ব পালন করি। দুইদিন টহল ডিউটি করার পর আমরা চেঞ্জ হই। পরবর্তিতে আমাদের দায়িত্ব পড়ে রামগড় থানার নিচে ফেনী নদীতে জনগণ কে পারাপারে সাহায্য করা। এই রকম চলতে থাকে। ৫ এপ্রিল সকালে মাঠে মেজর জিয়ার নির্দেশে ক্যাপ্টেন খালেকুজ্জামান অষ্টম ব্যাটালিয়ান এর একটি কোম্পানী নিয়ে পানি পথ মহালছড়ি-রাঙ্গামাটি নিরাপদ রাখার জন্য। বিকাল বেলা অস্ত্র ও গোলাবারুদ সহ ৭-৮টা চাঁদ এর গাড়ী করে রামগড় থেকে পাতাছড়া, গুইমারা, বড় পিলাক, সিন্ধুকছড়ি, ধুমনিঘাট ও পংক্ষিমুড়া হয়ে মহালছড়ি থানায় আসি। মাহালছড়ি থানায় আসার পর আমরা আদেশ পেলাম এলএমজি ও এমজির গুলি বেল্টে লোড করার জন্য। রাতের খাওয়ার কোন ব্যাবস্থা হলো না কোন রকম রাত কাটাই। ৬ এপ্রিল সকালে থানাতে রান্নার ব্যাবস্থা হয়। খাওয়ার পর নদী ঘাটে কয়েকটি লঞ্চ ও দেশী ইঞ্জিনচালিত বোট এ করে মহালছড়ি ও রাঙ্গামাটি পানি পথ নিরাপদ রাখার জন্য বাহির হই। অনেক রাতে হঠাৎ লঞ্চ থেমে যায়। সারেং বলে যে সামনে রাঙ্গামাটি জলজান ঘাট পাক সেনারা ডিউটিতে আছে। তখন ক্যাপ্টেন খালেকুজ্জামান এর নির্দেশে লঞ্চ পিছনে ঘুরিয়ে চাকমা রাজার ঘাটে থামে। নিরাপত্তার জন্য ডিউটি দিয়ে বাকিরা রেস্ট করে। ৭ এপ্রিল শনিবার ভোরবেলা সবাই জেগে লঞ্চে বসে হাত মুখ ধুই। আমার পাশেই ই পি আর এর একজন সৈনিক ব্রিটিশ এলএমজি নিয়ে বসা ছিল, লক্ষ করলাম হাত মুখ ধোলাই করলো না। লঞ্চে বসেই বা হাত দিয়ে পানি নাড়াচাড়া করছিল। এবং মাঝে মাঝে হাত ভিজিয়ে চোখে মুখে পানি দিচ্ছিল এবং তাকে দেখে মনে হচ্ছিল খুব চিন্তিত। এমন সময় বেশ দূরে ইঞ্জিনের শব্দ ভেসে আসে। প্রথমে মনে হল ইঞ্জিনচালিত বোট। ক্যাপ্টেন সাহেব ও সারেং ভালো করে দেখে এবং বুঝতে পারে যে পাক বাহিনীর একটা লঞ্চ। সাথে সাথে আমরা লঞ্চ ছেড়ে দিয়ে পাড়ে পজিশনে যাই।



পাকিস্তানি লঞ্চটি আমাদের দিকে আসতে আসতে হঠাৎ থেমে যায়। সেখান থেকে আমাদের লঞ্চ লক্ষ করে রকেট ফায়ার করে। ফলে আমাদের লঞ্চটি ডুবে যায়। কোন প্রতিউত্তর না পাওয়ায় পাক সেনারা ফিরে যায়। সবাইকে একত্রিত করার পর ক্যাপ্টেন সাহেব বলেন যে, সেদিন রাতে লঞ্চ নিয়ে ফেরত আসাতে পাক বাহিনী চারিদিকে টহল জোরদার করে। দুপুরের পর দুইটি মাছ ধরা জেলে নৌকা ব্যবস্থা করি। নৌকার মাঝিরা ছিলো সবাই সিলেটি। তাদের মাছ ধরা সাহায্য করি এবং চারিদিকে খেয়াল করে রাঙ্গামাটির দিকে যেতে থাকি। পাক বাহিনীর একটি স্পীড বোর্ড আমাদের নৌকার দিকে আসতে দেখে মাঝি ইশারায় বুঝায় পতাকা দেখিয়ে "পাকিস্তান, পাকিস্তান হায়"। তারা কাছে না এসে অন্যদিকে চলে যায়। আমাদের বহনকারী নৌকা রাঙ্গামাটির দিকে চলতে থাকে। বিকালে পাক বাহিনীর তিনটি স্পীড বোট আমাদের নৌকা থামায় এবং কাছে এসে চেক করার জন্য একজন পাক সেনা আমাদের নৌকায় আসে। মাঝি তাকে বুঝায় যে "হাম পাকিস্তান হেই" সাথে পাকিস্তানি পতাকা দেখায়। অন্য বোট থেকে একজন হাবিলদার বলে "ঠিক হেয় তুম জাও, জয় বাংলা মুক্তি দেখা তো মুঝে বাতাইয়ে, তুম মুসলিম, ম্যায় মুসলিম, তুম মেরা দোস্ত হেয়"। আমারা পাটাতনের নিচে থেকে সব কিছু অনুভব করছিলাম এবং প্রস্তুত ছিলাম। সবাই যদি নৌকায় উঠে তাহলে আক্রমণ করবো। পাক সেনারা চলে যাওয়ার পর ক্যাপ্টেন সাহেব বলেন যে, দুইবার বিপদ হতে রক্ষা পেয়েছি এবার আমাদের নৌকা ছেড়ে দিতে হবে। আমরা সন্ধ্যার আগে নানিয়ার চর রাঙ্গামাটি নদীর মাঝপথে অবস্থিত বুড়ির হাট টিলায় অবস্থান নেই। বুড়ির হাট টিলার তিন দিকে পানি একদিকে নালা তারপর হলো জঙ্গল। সারা রাত জোঁক ও মশার সাথে যুদ্ধ করতে হয়। ৮ এপ্রিল ভোরবেলায় ক্যাপ্টেন সাহেব বলেন যে "এই টিলায় থাকতে হবে, সকলে সতর্ক অবস্থায় থাকবে এবং চারিদিকে লক্ষ রাখবে শত্রু এর চোখ হতে বাঁচার জন্য বেশি চলাফেরা করা যাবে না, গাছের নিচে ঝোপ ঝাড়ের পাশে অবস্থান করবে"। আনুমানিক বেলা দুইটা তিনটার দিকে পাকিস্তান সেনার কমান্ডো ব্যাটেলিয়ান এর দুই কোম্পানী সৈনিক সাতটা স্পীড ও দুইটি লঞ্চ নিয়ে বোট বুড়ির হাট এর দিকে আসতে থাকে। আমাদের অবস্থান টের পেয়ে তারা অতর্কিত আক্রমণ করে। পাক সেনাদের লঞ্চে তিন ইঞ্চি মর্টার বসানো ছিল। এক সময় আমাদের অবস্থানের উপর মর্টার সেল ফেলা শুরু করে। ছোট টিলায় আমাদের অবস্থা হয়েছিল খই মুড়ি ভাজার মত। শেষে ক্যাপ্টেন অর্ডার দেয় পিছনে নিরাপদ এ অবস্থান নিতে। আমরা যারা রাইফেল ম্যান ছিলাম সবাই নালা পার হয়ে অবস্থান নেই। ই পি আর এর এলএমজি ম্যান মুন্সি আব্দুর রউফ (বীরশ্রেষ্ঠ) ফায়ার দিয়ে পাক সেনার

সাতটা স্পীড বোর্ড অকেজো করে দেয়। তখন বাধ্য হয়ে তারা পিছনে চলে যায় এবং পুনরায় মর্টার সেল ফেলা শুরু করে। হঠাৎ একটি সেল মুন্সি আব্দুর রউফ এর গানের উপর পড়ে এবং সাথে সাথে ফায়ার বন্ধ হয়ে যায়। একা কভারিং ফায়ার দিয়ে এবং নিজের জীবন দিয়ে সকলের প্রাণ রক্ষা করেন। তার দেহের শত শত টুকরাগুলো একত্রিত করে বুড়ির হাটে সমাহিত করা হয়। মুন্সি আব্দুর রউফ আমাদের মাঝে স্মরণীয় হয়ে আছেন। আমরা ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে যার যার অস্ত্র সহ বন, জঙ্গল, পাহাড়, টিলা, ঝরনা পার হয়ে পায়ে হেটে নয়নছড়ি পৌঁছাই। চাকমাদের সাহায্যে দেশি নৌকা করে মহালছড়ি থানায় পৌছায় ভোর রাতে। ৯ এপ্রিল আমরা কয়েকজন মাহালছড়ি থানার কোত ভেঙ্গে কিছু গুলি নিয়ে রামগড় আসার জন্য প্রস্তুত হই। ১০ এপ্রিল আমরা রামগড় থানায় পৌঁছাই। ক্যাম্প কমান্ডার লেঃ অলি আমাদের সব বিষয়ে অবগত হয়ে বলেন যে পরবর্তী আদেশের জন্য অপেক্ষা করতে সন্ধ্যার কিছু আগে ফলিন এর আদেশ আসে সবাই একত্রিত হলে আদেশ শুনানো হয় যে, গত ১৭ই এপ্রিল মেহেরপুরের বৈদ্যনাথ তলা বিশাল আমবাগানে সৈয়দ নজরুলকে অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট করে, তাজউদ্দিন, ক্যাপ্টেন মুনসুর ও কামরুজ্জামান কে নিয়ে অস্থায়ী সরকার গঠন করা হয়েছে। কর্নেল আতাউল গণি ওসমানী কে প্রধান সেনাপতি করে যুদ্ধ পরিচালনা করার জন্য দেশকে এগারোটি সেক্টরে ভাগ করা হয়। চট্টগ্রাম ও নোয়াখালী নিয়ে এক নম্বর সেক্টর গঠন করে। ১নং সেক্টর কমান্ডার হিসাবে মেজর জিয়াকে দায়িত্ব দেওয়া হয়। ১নং সেক্টর কমান্ডার মেজর জিয়া আদেশ দেন যে ,করের হাট রামগড় সড়কে রোড ব্লকের ব্যবস্থা নিতে হবে এবং সতর্ক ব্যাবস্থা নিতে হবে। ৩নং সেকশন কমান্ডার মোজাম্মেলের সাথে আমি সেকশন টু আইসি রামগড় চা বাগানে অবস্থান নেই। ২৪ এপ্রিল আনুমানিক একটা দেড়টার দিকে চা বাগানের উপর সেলিং শুরু হয়। ভাবগতি দেখে কমান্ডারের নির্দেশ মোতাবেক পাশে ফেনী নদী পার হয়ে ভারতের সাব্রুম এলাকায় প্রবেশ করার সময় ভারতীয় বাহিনী বাধা দেয় এবং ব্লাংক ফায়ার শুরু করেন। তখন আমরা বাধ্য হয়ে অস্ত্রসহ হাত উঠিয়ে আওয়াজ করতে থাকি, "জয় বাংলা, জয় বাংলা"। শেষে বন্ধু হিসাবে আমাদের গ্রহণ করে। প্রচন্ড সেলিং হচ্ছিলো। কিছু কিছু গোলা ভারতের মাটিতেও পরতে থাকে। তখন আমরাও ভারতীয় বিএসএফ একসাথে ফায়ার করতে থাকি। ফায়ার শেষে আমরা কোন দিকে যাবো কোন নির্দেশনা না পেয়ে সাবরুম বাজারে একটা চায়ের দোকানে বসেছিলাম। আনুমানিক রাত সাত ঘটিকার সময় মাইকে ঘোষণা হয় যে, "সকল বাঙ্গালী সৈনিক বাজারে এদিক ওদিক আসেন সবাই পাকা রাস্তা চলে আসেন" সকলে পাকা রাস্তায় আসার পর ভারতীয় বাহিনীর সেনাবাহিনীর



শক্তিমান গাড়ী, লরি করে প্রায় ত্রিশ মিনিট চলার পর এক জায়গায় গাড়ী থামে। সেখানে অনেক চেনা জানা মানুষের সাথে দেখা হয়। জানতে পারলাম এটি এক নম্বর হেড়কোয়াটার, এলাকার নাম হরিণা। ২৫শে এপ্রিল সকালে আমরা সবাই ফলিন হই। সেক্টর এডজুটেন্ট আদেশ যে, আজ সন্ধ্যার ভিতর নিজেদের থাকার জন্য টিলা কেটে জঙ্গল পরিক্ষার করে ঘর তৈরি করতে হবে। যে কথা সেই কাজ। ভারত সৈন্যের গেতি বেলচা দিয়ে কাজ শুরু। ২৬শে এপ্রিল সেক্টর কমান্ডার মেজর জিয়া ক্যাম্প এলাকা পরিদর্শন করেন। তিনি বলেন যে আমার একটি স্পেশাল ভলেন্টিয়ার প্লাটুন দরকার, এই প্লাটুন ফেনী সোনাপুর যাবে একটি বিশেষ অপারেশনে। যদি ওই এলাকার কেউ থাকে তাহলে ভাল হয়। আমরা কয়েকজন লাইন হতে আগে আসলাম, মেজর জিয়ার নির্দেশ মোতাবেক তালিকা তৈরি করা হয়। অর্ডার হলে এই দল সি টাইপ অস্ত্র সহ রেডি থাকবে।আদেশ পাওয়ার সাথে সাথে যেন এরা মুভ করতে পারে। ২৭এপ্রিল একজন ক্যাপ্টেন (নাম মনে নাই) সাথে মেজর জিয়া সাহেব ব্রিফিং করেন যে, এই দল নোয়াখালী জেলার ছাগলনাইয়া ও ভারতের আমলী ঘাট বিএসএফ বিওপি তে যাবে। সেখান থেকে গাইড এর সাহয্যে বাংলাদেশে গাইড এর মাধ্যমে প্রবেশ করবে। আদেশ পাওয়ার পর বিকাল বেলা অস্ত্রসহ শক্তিমান লরিতে করে রাত আনুমানিক ৭টার দিকে আমলীঘাট বিওপি তে পৌঁছাই। খাওয়ার পরে দেখি যে মেজর জিয়া ও লেঃ অলি আমাদের একজন গাইড দিলেন এবং বললেন যে, এই দল ফেনী সোনাপুর গ্রামে একজন কুমিল্লা সেনানিবাসে বন্দি ডাক্তার ক্যাপ্টেন এর ফ্যামিলিকে উদ্ধার করতে। সেকশন কমান্ডার নায়েক বশির ই পি আর এর নেতৃত্বে চলা শুরু করলাম গাইড এর পিছনে। মেঘলা রাত রাস্তাঘাট কাদাময়, চলতে চলতে ভোরের আযান শুরু হয়। আমরা চলা বন্ধ করে নিরাপদ স্থানে অবস্থান নিই। আকাশ পরিষ্কার হলে একটি টিনের খালি বাড়ির ভিতরে আমরা অবস্থান করি। গাইড বলে যে, এই গ্রামে কোন জনগণ নেই সবাই ভারতে চলে গিয়েছে। আমরা নিজেদের গোপনীয়তা রক্ষা করে পাহারায় থাকি আনুমানিক আড়াইটার দিকে খাবারের ব্যাবস্থা হয়। সবাই খাবারের জন্য রেডি হয়, এমন সময় সিএন্ডবি রোডের দিক হতে এলোপাতাড়ি ফায়ার শুরু হয়। আমরা খাওয়া ফেলে ওই স্থান ত্যাগ করি। ফেনী নদীর পাড়ে আড় দেখে অবস্থান নেই এবং দশ দিন ওই এলাকায় থাকি এবং বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করি। কিভাবে টারগেটে পৌছানো যায়। আমাদের গাইড আগেই পালিয়ে গিয়েছিল। ৬মে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যাবেলা ওই বাড়িতে পৌছাই এবং বাড়ির মালিক চাচা কে সবকিছু খুলে বলি। তিনি আমাদের খাওয়া থাকার ব্যাবস্থা করে। আমরা ওই

রাতের মধ্যেই ছাদের উপর এলএমজি পোস্ট সহ নিচে ব্যাংকার তৈরি করি। ৮ মে পাক বাহিনীর একটি হেলিকপ্টার আমাদের পজিশনের উপর দিয়ে উড়ে যায়। এলএমজি বসানোর আগেই হেলিকপ্টারটি রেঞ্জের বাহিরে চলে যায়। পুনরায় আসবে এই আশায় এলএমজি তাক করে বসে থাকি। বিকাল বেলা গ্রামের কয়েকজন মুরুব্বি আসে এবং বাড়ির মালিক চাচার সাথে আলাপ করে, তারা বলে যে, মুক্তিযোদ্ধারা আসার পরেই পাকিস্তানি হেলিকপ্টার আমাদের এলাকায় আসে মনে হয়, তারা আবার আসবে। মনে রাখবেন আপনার ব্যাক্তিগত সুবিধার জন্য যেন আমরা অসুবিধায় না পড়ি। মুরুব্বিরা বিদায় হলে চাচা বলেন, "বাবাজিরা হোন হেতারা আইয়া এখখানা অভিযোগ করচে বুজেন্নি, গা গেরামের ব্যাপার বুজেন্নি আন্নারা অ্যার তুন জানগা আল্লাহ ভরসা হেতি যা করেন অ্যাঁয় নো চাই আমার তুন গেরামের ক্ষতি হয়"। তিনি আমাদের উপর ছেড়ে দিলেন যা করার তাই করেন। আমরা চাচাকে বুঝালাম গ্রামের লোক অনেক কিছু বলবে। চারিদিকে সংবাদ নিই কোন দিকে যাবো। ১২মে সকাল থেকে আকাশ অন্ধকার সাথে বৃষ্টি। আমরা সবাই ঘরে বসা, এমন সময় একটা ছেলে সংবাদ দেয় ফেনী দিক থেকে পাক সেনারা আসছে। আপনারা ঘেরা পড়েছেন। সাথে সাথে আমরা বাড়ির সকলকে নিয়ে বাড়ি ছেড়ে দিয়ে গ্রামে চলে যাই। হাটতে হাটতে সি এন্ড রোড ক্রস করার সময় আমাদের উপর ফায়ার আসে। আমাদের জানা ছিল সি এন্ড বি রোড মুক্তিযোদ্ধাদের দখলে। আমরা আওয়াজ করি জয় বাংলা বলে কিন্তু ফায়ার কিছুতেই থামে না। শেষে আমরা সামনে অগ্রসর না হয়ে পিছনে এসে আড় নিয়ে অপেক্ষা করি। কিছুক্ষণ পরেই দূর পাল্লার আর্টিলারী ফায়ার শুরু হয় ফেনীর দিক থেকে। তখন আমরা নিরাপদ মনে করে যাত্রা শুরু করি। কিছুক্ষণ হাটার পরেই সি এন্ড বি রোড ক্রস করার সময় আমরা ফায়ারের মধ্যে পড়ে যাই। তখন সঙ্গিরা ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। ক্ষুদ্র অস্ত্রের সাথে টু ইঞ্চি মর্টার ফায়ার হচ্ছিলো। এই সময় আমার বাম পায়ে রানে সামনের দিক থেকে আসা গুলিতে গুলিবিদ্ধ হয়ে পিছন দিয়ে, বার হয়ে যায় সেই সাথে মর্টারের স্প্রিন্টার বা পায়ের গোড়ালী ও পিঠে লাগে। আহত অবস্থা জনগণ ও আমার সাথীরা আমাকে আমলীঘাট বি ও পি তে নেয়। সেখানে প্রাথমিক চিকিৎসা নেওয়ার পর মেজর জিয়ার আদেশক্রমে আমি সহ কয়েকজন আহতকে আগরতলা জি বি (গোবিন্দ বল্লব) ভারতীয় সেনাবাহিনীর গাড়িতে হাসপাতালে পাঠায়। রাত বারোটার দিকে পৌছালে ওটি তে নিয়ে ক্ষতস্থান গুলো পরিষ্কার করে ব্যান্ডেজ করার পর ওয়ার্ড এ নেওয়া হয়। আমরা যে ওয়ার্ড এ ছিলাম সেই ওয়ার্ড স্পেশাল মুক্তিযোদ্ধা ওয়ার্ড নামকরণ করা হয়। আমার বেড নম্বর ছিল এক্সট্রা। জি বি হাসপাতালে একমাস চিকিৎসা



নেওয়ার পর ডিসচার্জ করলে ১নং সেক্টর হেড কোয়াটার হরিয়ায় যাই। সেখানে এক সপ্তাহ থাকার পর পুনরায় ক্ষতস্থানে পুঁজ জমে এবং যন্ত্রনা শুরু হলে আগরতলা হেড কোয়াটার বি ডি এফ আসি। পরের দিন জি বি হাসপাতালে আউট ডোর রুগী হিসাবে ক্ষতস্থান দেখাই। ডাক্তার ভৌমিক চৌধুরী বলেন যে, দুই দিন পর পর ড্রেসিং করাতে হবে এবং মেডিসিন খেতে হবে। কয়েকবার এইভাবে জি বি হাসপাতালে যায়। ১৫ই মে ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী আগরতলা শরনার্থী শিবির পরিদর্শন করতে আসলে ওই দিন তিনি, মুক্তিযোদ্ধা স্পেশাল ওয়ার্ড পরিদর্শন করেন।তিনি প্রতিটি রুগীর সাথে দেখা করেন। প্রধানমন্ত্রীর সাথে দেশ-বিদেশের গণ্য মান্য ব্যাক্তিরা ছিলেন। এটা তখন ভিডিও হচ্ছিল। হেড কোয়াটার বি ডি এফ এর অবস্থা ছিল ৯৩ বি এস এফ হেডকয়াটার এলাকায় (শাল বাগান ও গান্ধী গ্রাম) হেড কোয়াটার বি ডি এফ সেনাপতি আতাউল গণি ওসমানী থাকতেন। ওইখানে একটি হাসপাতাল গঠন হয়।বিভিন্ন সেক্টর এর যুদ্ধ ক্ষেত্র হতে নিহত ও আহতদের আনা হত। বি ডি এফ হেড কোয়াটার ট্রানজিট হিসাবে ব্যাবহার হতো। আমরা আহতরা হালকা কাজ করতাম। মাঝে মাঝে খুব ব্যাথা করতো এবং এর ফাঁকেই দুই সপ্তাহ ভারতীয় সেনাবাহিনীর আর্টিলারী রেজিমেন্ট এর, মর্টার প্লাটুনে ৮২ এম এম মর্টার প্রশিক্ষণ গ্রহণ করি। এক সময় পায়ের অবস্থা খুবই খারাপ হয়। তখন হেড কোয়াটার বি ডি এফ হাসপাতালে ১৮-০৬-১৯৭১ তারিখ হতে ২০-১০-১৯৭১ পর্যন্ত চিকিৎসা নেই। বি ডি এফ এডজুটেন্ট রোল কলে বলেন যে, আহত যারা এখানে আছে তারা সকলে যে যার সেক্টর তালিকাই নাম থাকবে। এই আদেশ হবার পর আমি আর সেক্টর হেড কোয়াটারে যাইনি। দেশ স্বাধীন হবার পর জেনারেল উসমানী সহ বি ডি এফ হেড কোয়াটার এর সাথে কুমিল্লা হয়ে ঢাকা সেনানিবাসে আসি। কয়দিন থাকার পর আদেশ হয় সবাই এক সপ্তাহের জন্য বাড়ি যেতে পারবে। ঢাকা হতে বাড়ি আসতে তিন দিন সময় লাগে। বাড়ি ফেরার পথে দেখি রাস্তাঘাট, গ্রামগঞ্জ সবকিছুই বিধ্বস্ত। গ্রামে আসলে সবাই দেখতে আসে এবং সবাই জানতে চায় কিভাবে গুলি লাগে এবং কিভাবে আমার চিকিৎসা হয় আমি কোথায় কিভাবে ছিলাম ইত্যাদি। এরপর আমি ২৯ বছর কোর অফ ইঞ্জিনিয়ারস এ চাকুরীর মেয়াদ শেষ করে সিনিয়ার ওয়ারেন্ট অফিসার পদে অবসর গ্রহণ করি।

## বীর মুক্তিযোদ্ধা মো. মিজানুর রহমান বাচ্চু
## (যুদ্ধকালীন কমান্ডার)
**১ খানপুর মেইনরোড, নারায়নগঞ্জ**

মুক্তিযোদ্ধাদের ছোট ছোট গ্রুপ নৌকা দিয়ে নদী পার হচ্ছে নদীর এপারে ভারতের উত্তর চব্বিশ পরগনার বাগুন্ডি, ঐ পারে দেবহাটা, দেবহাটা নেমেই মুক্তিযোদ্ধারা ক্রলিং করে সামনে যাচ্ছিল। পুরো দলের মোট ৭০ জন মুক্তিযোদ্ধা। নেমেই আমিও ক্রলিং শুরু করলাম। পাশে ক্যাপ্টেন সুলতান উদ্দিন, আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার তিন নম্বর আসামি। ঘুটঘুটে অন্ধকারে কাছের জিনিস দেখতে খুব অসুবিধা হচ্ছিল। ক্যাপ্টেন সুলতান উদ্দিন আমাকে জিজ্ঞেস করলেন বাচ্চু রাস্তা ঠিক যাচ্ছি তো? আমিও নিশ্চিত না যে আমরা ঠিক রাস্তায় যাচ্ছি কিনা। আগের দুই দিন ওখানকার আশেপাশের এলাকায় রেকি করে গেছি কিন্তু অন্ধকারে সবকিছুই অচেনা লাগছে। তারপরও আমি জোর গলায় বললাম আমরা ঠিক রাস্তায় যাচ্ছি ক্যাপ্টেন, স্যার চিন্তা করবেন না। রাত প্রায় এগারোটা নদীর পাড়ে প্রায় ১০০০ গজ ক্রলিং করতে হবে এ ছাড়া উপায় নেই। ওইখানে পাকিস্তানি আর্মিদের একটা বড় ক্যাম্প। ক্যাম্প থেকে সরাসরি সামনে নদী, ক্যাম্পের সামনের দিক দিয়ে যেতে পারলে দূরত্ব কম হতো কিন্তু ক্যাম্প থেকে সামনের দিকে নদীটা পুরোপুরি দেখা যায় ফলে এদিক দিয়ে নামলে আর্মিদের নজরে পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা ছিল। তাই আমরা একটু দূরে গিয়ে নেমেছি। ক্যাম্পের দুদিকে ফসলের মাঠ। একদিকে সামান্য জঙ্গল, নদীর ঠিক উল্টো দিকে ইট বিছানো রাস্তা। এ রাস্তা দিয়ে সাতক্ষীরা হয়ে যশোর পর্যন্ত যাওয়া যায়। এই ক্যাম্প থেকে আর্মির এই গ্রুপটিকে হটাতে পারলে সাতক্ষীরা একটা বড় অংশ মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়ন্ত্রণে চলে আসবে আর এ ক্যাম্প থেকে নদী পার হয়ে প্রাই পাকিস্তানি হানাদাররা ওপারে মুক্তিযোদ্ধাদের অবস্থানে হামলা চালাতো, সেটাও বন্ধ করা যাবে। ওই ক্যাম্পে কতজন আর্মি থাকে তা ঠিক আমরা নিশ্চিত না। তবে আমরা খবর পেয়েছি ১০০ এর মত আর্মি থাকে। ক্রলিং করে এসে আমরা দেবহাটা থানার ৪০০ গজ এর মধ্যে অবস্থান নিলাম থানার তিন দিক থেকেই আমরা ঘেরাও করে ফেলেছি। ক্যাপ্টেন সুলতান উদ্দিন তখন হিসাব কষছেন এখনই হামলা করবেন না আরো পরে। যদি সত্যিই ওদের সংখ্যা একশোর বেশি হয় আর গোলাবারুদ যথেষ্ট পরিমাণ থাকে তাহলে হামলা করলে যুদ্ধ সময় নিয়ে হবে। আমরা ভালো করতে না পারলে পিছনে ফেরা কঠিন।কারণ নদীর পাড়ে



তুলনায় ক্যাম্প এর আশেপাশের জায়গা উঁচু পেছন ফিরতে চাইলে নদী দিয়ে একসাথে পার হতে গেলে নৌকায় গ্রেনেড হামলা করে ওরা নৌকা ডুবিয়ে দিতে পারে। আর অনেক দূর পর্যন্ত ফাঁকা মাঠ দৌড়ে পালানো যাবে না। দেবহাটার স্থানীয় আরেকটি গ্রুপ আর নদীর ওপারের হিঙ্গলগঞ্জ থেকে একটি গ্রুপ আসার কথা। ওই দুইটা গ্রুপ আর আমাদের গ্রুপ এই তিনটি গ্রুপ মেজর জলিলের নেতৃত্বাধীন। ওই গ্রুপ দুটি আমাদের সাথে না আসলে হামলা করা কঠিন হবে। জঙ্গলের দিকে যেসব মুক্তিযোদ্ধারা ছিল মশার কামড়ে তাদের অবস্থা খারাপ হয়ে গেল। মশা যেন এক এক জনকে উড়িয়ে নিয়ে যাবে কিন্তু কিছু করার নেই মশা মারার শব্দটিও হতে দেয়া যাবে না শত্রুপক্ষ আমাদের অবস্থান টের পেয়ে যেতে পারে। ক্ষেতের আইলে যারা পজিশন নিয়েছিল তাদের জন্য সমস্যা দীর্ঘক্ষণ পজিশন নিয়ে থাকায় শামুকেরা মনে করেছে মানুষগুলো স্থায়ী বস্তু তারা আরামে গায়ের উপর দিয়ে হেটে হেটে যাচ্ছে, ইঁদুর ও মাঠ পার হতে গিয়ে অনেকের গায়ের উপর দিয়ে যাচ্ছে নড়াচড়া করার উপায় নেই। রাত দুইটায় অশোক ক্রলিং করতে করতে ক্যাপ্টেন সুলতান উদ্দিন এর কাছে এলো। অন্য গ্রুপ দুটি কাছে এসে পজিশন নিয়েছে, সিগন্যাল ফায়ার করলাম আমি। এরপর শুরু হল মুহুর্মুহু গুলি ছোড়া। কিন্তু টানা পাঁচ মিনিট গুলি ছোড়ার পর একটাও পাল্টা গুলি এলোনা, ক্যাপ্টেন চিৎকার করে বললেন স্টপ। গুলিবর্ষণ থেমে গেল, ক্যাপ্টেন প্রথমে ৫ মিনিট সময় নিলেন ৫ মিনিটের মধ্যে পাল্টা জবাবে তিনি আবার শুরু করবেন কিন্তু পাঁচ মিনিটের মধ্যে কোন জবাব দিল না, নিজে থেকে ক্যাপ্টেন সময় বাড়ালেন ১০ মিনিটে, ২০ মিনিট আধাঘণ্টায় এক ঘন্টা। আমি ক্যাপ্টেন স্যারকে বললাম সামনে এগিয়ে দেখব? তিনি বললেন না এটা ফাঁদও হতে পারে ওদের হয়তো দূরপাল্লার অস্ত্র-গুলি কম তাই গুলি না করে আমাদের সামনে যাওয়ার সুযোগ দিচ্ছে, ওরা গুলি না করলেও সামনে যাওয়া যাবে না ধৈর্য ধরো। হঠাৎ ঐ পাশ থেকে একটা যান্ত্রিক কর্কশ শব্দ এসে লাগল কানে, ক্যাপ্টেন গুলি ছুড়তে যাচ্ছিলেন কিন্তু পরমুহুর্তে নিজেকে সামলে নিলেন আওয়াজটি গাড়ির ইঞ্জিনের সম্ভবত আর্মি ভ্যান এর। মোসলেউদ্দিন বলল ক্যাপ্টেন স্যার ওরা মনে হয় পালাইতেছে। হা তাই মনে হয়, আবার এটাও ফাঁদের অংশ হতে পারে ভাব দেখাচ্ছে ওরা চলে যাচ্ছে। আসলে ওরা ভেতরেই আছে ভোর হওয়ার আগ পর্যন্ত আমরা সামনের দিকে এগোবো না। যুদ্ধ করতে হলে ভোরেই করব। সবাই ভোর হওয়ার জন্য অপেক্ষা করতে লাগলাম। আমরা প্রায় দেড়শ মুক্তিযোদ্ধা। রাত অনেক হয়েছে কিন্তু কারো চোখে ঘুমের লেশমাত্র নেই। সবার চোখ কান খোলা এক মুহূর্তের ঢিলেমিতে মহা বিপর্যয় নেমে আসতে পারে, ভুল করা যাবেনা,

যুদ্ধক্ষেত্রে ভুলের কোন ক্ষমা নেই। অবশেষে ভোর হলো দেবহাটা থানা পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে, তিন দিক থেকে খোঁজ নেয়া হলো কোনো দিক থেকেই থানার ভিতরে কোন মানুষ দেখা যাচ্ছে না কোন নাড়াচাড়া নেই। কোন আর্মস এ্যামোনিশন এর চিহ্ন নেই মাইন পুতে রাখা হয়েছে কিনা সেটা পরীক্ষা করা হলো তাও নেই। আমাদের ছোট একটা দল প্রথমে এগিয়ে গিয়ে থানার চারপাশে ঘুরে আসলো। ভেতরে কেউ নেই এরা ফিরে আসার পর ক্যাপ্টেন সিদ্ধান্ত নিলেন সামনে এগোনোর। ঠিক এমন সময় একজন পাকিস্তানী সৈন্য কে দেখা গেল ভিতরে ঢুকেছে। আরেকটু হলে আমরা তাকে গুলি করে দিচ্ছিলাম। ক্যাপ্টেন সবাইকে থামালেন থানার চারদিক থেকে ঘিরে সামনের দিকে গেলাম আমরা। কভার নিয়ে নিয়ে প্রবেশ করলাম ভিতরে। পাওয়া গেল এই এইমাত্র থানায় প্রবেশ করা সৈন্যটিকে। আমাদের দেখে চমকে উঠল সে চোখেমুখে মৃত্যু আতঙ্কে ঝাঁপিয়ে পড়ল ক্যাপ্টেনের পায়ে। "মুঝকো মাৎ মারো মুঝকো মাৎ মারো" ক্যাপ্টেন ইংরেজিতে জিজ্ঞেস করলেন বাকীরা কোথায়? সৈন্যটিও ইংরেজিতে উত্তর দিলো সবাই চলে গেছে যশোরের দিকে। ক্যাপ্টেন আবার জিজ্ঞেস করলেন তাহলে তুমি এখানে কেন? এবার সৈন্য টি উর্দুতে জবাব দিলো "লোটা কম্বল লেনেকো আয়া"। লোকটার কথা শুনে ক্যাপ্টেন হাসবেন না কাঁদবেন বুঝতে পারলেন না। এই লোক কি বোকা নাকি, সবাই জীবন বাঁচাতে পালাচ্ছে আর সে এসেছে তার লোটা কম্বল নিতে। পাকিস্তানি সৈন্যটি জানাল ওদের গ্রুপের সব সৈন্য পাঞ্জাবি শুধু ও বেলুচিস্তানের বাসিন্দা। রাতে দেবহাটা থানা ছাড়ার পর কেউ তাকে কম্বল বা অন্য জিনিসপত্রের ভাগ দিতে রাজি হয়নি। সে ঠান্ডা সহ্য করতে না পেরে তার জিনিসপত্র নিতে এখানে এসেছে। সে আরো জানালো ওদের গ্রুপে শতাধিক সৈন্য ছিল, গোলাবারুদও ছিল অনেক কিন্তু তারা মুক্তিযোদ্ধাদের ভয়ে প্রচন্ড আতঙ্কিত, তাই তারা যুদ্ধ না করে পালানোর সিদ্ধান্ত নেয়। আমরা সৈন্যটিকে গ্রেপ্তার করে তুলে দিলাম মিত্রবাহিনী ভারতীয় সেনাদের হাতে।

## বীর মুক্তিযোদ্ধা রোটারিয়ান আলহাজ্ব খন্দকার মোদাচ্ছের আলী (পি.এইচ.এফ.)

**শোমসপুর খোকসা, কুষ্টিয়া**

১৯৭১ সাল। আমি তখন এস.এস.সি পরীক্ষার্থী। পরীক্ষা হবে কিনা জানিনা। সারা দিন মিছিল মিটিং আর দেশের ভীবষ্যৎ কি হবে এই নিয়ে আলোচনা করে সময় পার করছি। সন্ধ্যা হলে রেডিওর সামনে শত শত লোক বসে যায় বিবিসির সংবাদ শোনার জন্য। আমাদের বাড়ি কুষ্টিয়া জেলার প্রত্যন্ত গ্রামে। গ্রামের নাম- শোমসপুর, আমাদের গ্রামের উপর দিয়ে গোয়ালন্দ রাজবাড়ি, কুষ্টিয়া পোড়াদহ রেললাইন চলে গিয়েছে। এটাই সারাদেশের সাথে আমাদের এই অঞ্চলের মানুষের যোগাযোগের একমাত্র মাধ্যম। আমাদের গ্রামের মধ্যেই একটা রেলষ্টেশন আছে, নাম-খোকসা। রেল লাইনের পাশ দিয়ে চলে গেছে রেলের টেলিফোন লাইন। সকাল সন্ধ্যা লোকজন এই ষ্টেশন এবং ষ্টেশনের মাষ্টার এর মাধ্যমে বিভিন্ন এলাকার খোজ খবর নিত। আমাদের এলাকায় তখন কোন বিদ্যুৎ ছিল না। যোগাযোগের জন্য রাস্তাঘাট খুব একটা ছিল না। এখান থেকে পাঁচ কিলোমিটার দক্ষিণে গড়াই নদী, সাত কিলোমিটার উত্তরে পদ্মা নদী। বন্যার সময় এলাকার বেশীর ভাগ জায়গা ডুবে যেতো, তখন নৌকা ছাড়া কোন কিছুই করা যেতো না। ২৫শে মার্চ ১৯৭১। রাত ৩টা। মনছের পাগলা মুখে চোঙা নিয়ে চিৎকার করতে শুরু করল জয় বাংলা, জয় বাংলা। ডাকতে শুরু করল আপনারা সব জেগে উঠুন। খাঁন সেনারা আমাদের উপর হামলা চালিয়েছে। উল্লেখ্য; মনছের আলী সর্দারকে সকলে "জয় বাংলার পাগল" বলে ডাকত। ১৯৭১ সালে পাক আর্মির গুলিতে তিনি শহীদ হন। ইতিপূর্বে বহুবার মনছের আলীর এমন ডাক শুনেছি। তাড়াতাড়ি বিছানা ছেড়ে উঠলাম। রেল ষ্টেশনের দিকে রওনা হলাম। সাধারণত রেলষ্টেশনে গেলেই সকল সংবাদ পাওয়া যাবে বলে আমরা সবাই জানতাম। ষ্টেশনে পৌঁছে দেখলাম অনেক লোক। তার মধ্যে এই মুহুর্তে যাদের কথা মনে পড়ছে- আওয়ামী লীগের খোকসা থানা সেক্রেটারী ডা: রবিউল বারী, খন্দকার সিরাজুল ইসলাম, মিয়া মমতাজ হোসেন, কে এম মহসীন, সামসুদ্দিন খাঁন (চেয়ারম্যান), আহম্মদ আলী, বদরুল আলম, রফিকুল আলম (তালম), গোলাম ছরোয়ার (বুদো), খন্দকার হাবিবুর রহমান, আব্দুস সাত্তার মোল্লা (সাদ) সহ আরও অনেকে। ষ্টেশন মাষ্টার সাহেব জানালেন রাজারবাগ পুলিশ লাইন, পিলখানা ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পাকিস্তানি আর্মি বাঙালিদের উপরে আক্রমণ করেছে। ঢাকায় হাজার হাজার মানুষ মারা গেছে। আমাদের পুলিশ ও ইপিআর

বাহিনী তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করেছে। শেখ সাহেব (বঙ্গবন্ধু) বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেছেন। উপস্থিত সকলে আলোচনা শুরু করলো, আমরা রেল লাইন উপড়ে ফেলব কিনা? রাস্তা ঘাট বন্ধ করে দিব কিনা? যাই হোক পরে সিদ্ধান্ত হলো পাশের থানা পাংশার ও আমাদের এম পি এ সাহেবদের সাথে পরামর্শ করে তারপর যা হয় করা যাবে। সকলে মিছিল শুরু করলাম "জয়-বাংলা, বাংলার জয়"। "বীর বাঙ্গালী অস্ত্র-ধর-বাংলাদেশ স্বাধীন কর"। "পদ্মা-মেঘনা-যমুনা তোমার আমার ঠিকানা" ইত্যাদি স্লোগান দিয়ে বিভিন্ন রাস্তা প্রদক্ষিণ করলাম। পরদিন আমরা ছাত্র ও যুবক যারা ছিলাম তারা সকলে একসাথে আলোচনায় বসলাম এখন আমাদের করণীয় নিয়ে। কিভাবে অস্ত্র যোগাড় করা যায়, কিভাবে যুদ্ধ শুরু করা যায়? খবর পেলাম কুষ্টিয়া শহরে পাক আর্মি এসে গেছে, তারা সার্কিট হাউস, টেলিগ্রাফ অফিস, পোষ্ট অফিস, ডিসি অফিস ইত্যাদি জায়গায় ক্যাম্প করেছে এবং কুষ্টিয়া শহরে কারফিউ জারি করা হয়েছে। সকল টেলিফোন লাইন কেটে দিয়েছে। সারাদেশের সাথে আমাদের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন। রেডিওতে বিবিসি-র খবরই একমাত্র ভরসা। আর কিছু কিছু খবর পেতাম আহম্মদ আলী মিয়া, মমতাজ হোসেন ও আওয়ামী লীগ খোকসা থানার সেক্রেটারী ডাঃ রবিউল বারি সাহেবের কাছে। মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতি ও প্রতিরোধঃ ২৫শে মার্চ ঢাকায় আক্রমণের পরপরই লেঃ আতাউল্লাহ শাহ্, ক্যাপ্টেন শাকিল, ক্যাপ্টেন সামাদ ও মেজর শোয়েব এর নেতৃত্বে ২৭ বালুচের এক কোম্পানী সৈন্য কুষ্টিয়া পুলিশ লাইন আক্রমণ করে এবং নির্বিচারে গুলি চালিয়ে ব্যাপক হত্যাকান্ডের মাধ্যমে কুষ্টিয়া পুলিশ লাইন দখল করে নেয়। কুষ্টিয়া থেকে কিছু পুলিশ ও আনছার পালিয়ে আমাদের এলাকায় এসে আশ্রয় নেয়। আমাদের এলাকার লোকজনও সব কুষ্টিয়া শহর থেকে গ্রামে চলে আসে। আমাদের এলাকার তৎকালিন আওয়ামী লীগ নেতা মোল্লা আবুল কালামও গ্রামে ফিরে আসেন এবং সকলকে প্রস্তুতি নিতে বলেন। ২৮শে মার্চ কুমারখালী জে.এন হাই স্কুলের মাঠে এক প্রতিবাদ সভার আয়োজন করা হয়। ব্যাপক গণহত্যা ও বাঙ্গালি নিধনের বিরুদ্ধে। সভায় সভাপতিত্ব করেন খোকসা কুমারখালীর তৎকালীন এম.পি. এ জনাব গোলাম কিবরিয়া। খোকসা-কুমারখালীর প্রতিটি ইউনিয়ন থেকে ছাত্র, জনতা, আনসার, অবসারপ্রাপ্ত ই.পি.আর সহ সর্বস্তরের মানুষ জে.এন. স্কুল মাঠে সমাবেত হতে থাকে। তাদের হাতে ঝাঁটা, লাঠি, দা, ঢাল, সড়কি, বল্লম আর চোখ মুখে প্রতিশোধের তীব্র আগুন, বুকে স্বাধীন বাংলাদেশের স্বপ্ন। উপস্থিত নেতৃবৃন্দের মধ্যে ব্যারিস্টার আমীর-উল ইসলাম, (এম.এন.এ) কাজী হেদায়েত হোসেন (এপিএ), এ্যাডভোকেট এম. এ. বারি, নুর আলম জিকু, আব্দুল মজিদ, আব্দুল আজিজ খান, আসম ওয়াহেদ পান্না, রেজাউল করিম হান্নান, ডাঃ রবিউল বারি, মিয়া মমতাজ হোসেন, আহম্মদ আলী, মোল্লা আবুল কালাম সহ আরও অনেকে উপস্থিত ছিলেন। প্রধান অতিথি ব্যরিস্টার আমিরুল ইসলাম প্রত্যক্ষ মুক্তিযুদ্ধের



মাধ্যমে হানাদারদের পরাজিত করে স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার আহবান জানান। জনাব গোলাম কিবরিয়া প্রত্যেক ইউনিয়নের নেতা কর্মিদেরকে নিজ নিজ এলাকার আনসার, অবসর প্রাপ্ত ইপিআর, বেঙ্গল রেজিমেন্টের সদস্য ও ছাত্র জনতা নিয়ে কুমারখালী আওয়ামী লীগ অফিসের সামনে সমাবেত হওয়ার আহ্বান জানান। তার আহ্বানে সারা দিয়ে সবাই সেখানে হাজির হন। তাঁর নির্দেশে আনছার কমান্ডার সমীর উদ্দিনের নেতৃত্বে এই দলটি আওয়ামীলীগ অফিসের সামনে হাজির হন। সেখানে আরও উপস্থিত হন কাজি হেদায়েত হোসেন (রাজবাড়ি) (এমপিএ) আব্দুল মতিন (মাছপাড়া), আনছার উদ্দিন রাজা মিয়া, ছাত্র নেতা আজাদ খোকসার আবুল কালাম মোল্লা, ডাঃ রবিউল বারি, মিয়া মমতাজ হোসেন, আহম্মদ আলী, আব্দুল মজিদ প্রমুখ। আনছারদের অস্ত্র ছাড়াও থানা থেকে অস্ত্র ও গুলি সরবরাহ করা হয়। থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সাইদুর রহমান তাদের শপথ বাক্য পাঠ করান। যাদের অস্ত্র নাই বিশেষ করে যুবকদের স্বেচ্ছাসেবক হিসাবে নেওয়া হলো। বিভিন্ন বাড়ী বাড়ী থেকে রুটি সংগ্রহ করে ডাব নারিকেল সংগ্রহ করে মুক্তিযোদ্ধাদের সরবরাহ করার দায়িত্ব দেওয়া হলো তাদের। এ কাজে মিয়া মমতাজ হোসেনকে খোকসার দায়িত্ব দেওয়া হলো। আমরা তার সঙ্গে কাজ শুরু করলাম। ইতিমধ্যে পাকিস্তানি বাহিনী কুষ্টিয়ার সকল টেলিফোন সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে এমতাবস্থায় ভেড়ামাড়া-পোড়াদাহ, প্রভৃতি স্থানের মতো সকলের সহযোগিতায় এখানেও কন্ট্রোল রুম স্থাপন করা হল। ষ্টেশন মাষ্টার আইয়ুব আলী, ডাঃ আলাউদ্দিন ও গাজী হাবিবুর রহমানের উপর দায়িত্ব দেওয়া হয় কন্ট্রোল রুম পরিচালনার। এই গ্রুপের নামকরণ করা হয় রাইজিং সান, টেলিফোন অপারেটর আব্দুল সবুরের সাহায্যে লাহিনি পাড়াতেও অস্থায়ী একচেঞ্জ (পরিত্যাক্ত রেল কোয়াটার) স্থাপন করে টেলিফোন যোগাযোগ ব্যবস্থা চালু করা হয়। কুষ্টিয়া আক্রমণের চুড়ান্ত পরিকল্পনা করা হয়। মেজর আবু ওসমান চৌধুরী, এসডিও তৌফিক এলাহি চৌধুরী, আব্দুর রউফ চৌধুরী, ডাঃ আসহাবুল হক (হেবা ডাক্তার), আজিজুর রহমান আক্কাস (এম.পি.এ), নূর আলম জিকু, এ্যাডভোকেট আব্দুল বারি সহ সামরিক বেসামরিক কর্মকর্তাদের উপস্থিতিতে। আনসার-ই.পি.আরদের পাঁচ ভাগে ভাগ করে বিভিন্ন দিক দিয়ে কুষ্টিয়ার সবকটি অবস্থানের উপরে একই সাথে আক্রমণ করার নির্দেশ দেওয়া হয়। তাদের একটি গ্রুপের প্রধান ক্যাপ্টেন আমিনুল হক, কুমারখালীর মোকাদ্দেস হোসেনকে সহযোগী হিসেবে নিয়ে চুয়াডাঙ্গা থেকে ঝিনাইদহ-শৈলকুপার জিকে ক্যানাল ধরে অগ্রসর হয়ে সান্দিয়ারা-যদুবয়রা হয়ে কুষ্টিয়ার কাছাকাছি কমলাপুর গ্রামে অবস্থান নেন। তারা পথে বেশ কয়েক জায়গায় বাধার সম্মুখীন হন। যদিও অল্পসময়ের মধ্যেই স্থানীয় জনগণের সহাতায় তারা বাধাগুলো পার হয়ে নির্ধারিত স্থানে পৌছান। ক্যাপ্টেন আমিনুল হককে দায়িত্ব দেওয়া হয় কুষ্টিয়ার পূর্বাংশের আনসার জনতাকে সাথে নিয়ে মিলপাড়াস্থ ছোট ওয়ারলেস ষ্টেশন আক্রমণ করে

অবস্থানটি দখলে নেওয়ার। ৩০ শে মার্চ ভোর রাতে একযোগে পাক বাহিনীর প্রতিটি অবস্থানের উপর আক্রমণ করা হয়। প্রচন্ড আক্রমণে পাকবাহিনী দিশেহারা হয়ে পড়ে। এখানকার পাক বাহিনীর বেশির ভাগই নিহত হয়। অবশেষে মুক্তিযোদ্ধারা ছোট ওয়ারলেসের অবস্থানটি দখল করতে সক্ষম হয়। পাক সেনাদের সাথে আমাদের মুক্তিযোদ্ধাদের প্রচন্ড যুদ্ধ চলছে সারা কুষ্টিয়া শহর জুড়ে। শুধু ইপিআর ও আর্মসধারী আনসার বাহিনীই নয় সাধারণ মানুষও লাঠি, তীর ধনুক, ঢাল, সরকি, বন্দুক, ফালা, বল্লম নিয়ে জয় বাংলা স্লোগান দিয়ে পাক আর্মিদের চারপাশ দিয়ে ঘেরাও করে। বারখাদা, উদিবাড়ি, বাড়াদী, মঙ্গলবাড়ীয়া, কবুর হাট, বটতৈল, চৌড়হাস, মোল্লাতেঘরিয়া, জগতি, মজমপুর, হরিপুর, ঘোড়ারঘাট, গট্রিয়া, বানিয়াপাড়া, কয়া, লাহিনী পাড়া, ছেউড়িয়া অঞ্চলসহ আরও দুর দুরান্ত গ্রাম হতে সাধারণ মানুষ বিভিন্ন দেশীয় অস্ত্রসহ জমা হয় এবং পাকিস্ত ানিদের সাথে যুদ্ধরত মুক্তিবাহিনীকে নানারকম সাহায্য করতে থাকে। জয়বাংলা স্লোগান দিয়ে আকাশ, বাতাস, প্রকম্পিত করে মুক্তিবাহিনীকে উৎসাহিত করে। রাজবাড়ীর এমপিএ আওয়ামী লীগ নেতা কাজী হেদায়েত, এমপি এ খন্দকার নুরুল ইসলাম স্পেশাল ট্রেন যোগে পুলিশ আনছার ও জয়বাংলা বাহিনী পাঠান কুষ্টিয়ায় যুদ্ধরত মুক্তিবাহিনীকে সাহায্য করার জন্য আমরাও তাদের সঙ্গে যোগ দেই। পাবনা থেকে পদ্মা পার হয়ে একদল পুলিশ কুমারখালী পুলিশের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পাকিস্তানি বাহিনীর উপর হামলা করে। উল্লেখ্য যে, সুলতানপুর গ্রামের ৬৫বছর বয়স্ক বৃদ্ধ ডাঃ আলাউদ্দিন (কালু ডাক্তার) তার নিজস্ব বন্দুক নিয়ে পাক বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করেন যা এখনো ভুলবার নয়। গগণ বিদারী জয়বাংলা স্লোগান ও মুক্তিবাহিনীর হামলার মুখে নিস্তে জ হয়ে যায় পাকবাহিনী। ৩১শে মার্চ যুদ্ধে ২৫০ জন হানাদার বাহিনীর মধ্যে ৮৫জন মারা যায় যুদ্ধের মাঠে, বাকী ১৬৫জন পালাতে গিয়ে জনগণের হাতে মারা যায়। মুক্তি বাহিনীর পক্ষে শহীদ হন আব্দুল কুদ্দুস, হাসমত আলী, সিরাজুল ইসলাম, দুইপায়ে গুলিবিদ্ধ হয়ে গুরুতর আহত হন, ছাত্রনেতা ও জয়বাংলা বাহিনীর কমান্ডার আব্দুল মোমেন, আহত হন ইপিআর সদস্য আনোয়ার হোসেন, পুলিশ সদস্য হাবীব, আনছার সদস্য-আনছার আলী, ছাত্রনেতা জাফর উল্লাহ খানসহ আরো অনেকে। আমাদের প্রাথমিক বিজয় হয়।

পাক বাহিনীর প্রবেশ ও গণহত্যা: মুক্তিযুদ্ধের প্রথম প্রতিরোধের সফল অংশগ্রহণের পরে খোকসা-কুমারখালী-মাছপাড়া-পাংশা এলাকার রাস্তার দুই পাশের ভবনগুলিতে স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকায় ভরে যায়। এ সময় এলাকার মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দ স্থানীয় এম.পি.এ. জনাব গোলাম কিবরিয়ার সাথে সাক্ষাৎ করে তার প্রতি সমর্থন জানায়। কিন্তু পরিস্থিতির দ্রুত পরিবর্তন ঘটতে শুরু করে। ১১ই এপ্রিল পাক সেনারা কুমারখালীতে বিমান হামলা চালায়। গুলবাহার টেক্সটাইলের উপর বোমা বর্ষণে-ওমর আলি নিহত হয় এবং ২৫-৩০ জন আহত



হয়। এছাড়াও কুমারখালী গরুরহাট, রেললাইন, জে.এন.স্কুল, কাপড়ের পট্টি, মাদ্রাসা সহ বিভিন্ন জায়গায় গোলাবর্ষণ করা হয়। গরুহাটে এক শিশু ও মাদ্রাসার কাছে এক গাড়িওয়ালা শেলের আঘাতে প্রাণ হারান। এছাড়াও সেরকান্দিতে দুই জন নিহত এবং তেবারিয়ায় মহিলাসহ বেশ কয়েকজন আহত হয়। প্রতিরোধ যুদ্ধে সহায়তা করার জন্য ছেউরিয়াতে ওমর আলী, মোহাম্মাদ আলী এবং পিয়ার টেক্সটাইলের মালিক মোঃ সামসুদ্দিনকে বাড়ী থেকে ডেকে নিয়ে হত্যা করে। কুষ্টিয়াতে মুক্তিযোদ্ধাদের অবস্থানের পতন ঘটে ১৪ এপ্রিল। খোকসা-কুমারখালীর এম.পি.এ জনাব গোলাম কিবরিয়া সকলকে উন্নত প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে দেশকে মুক্ত করার আহ্বান জানান। ১৯৭১ সালের ১৭ই এপ্রিল প্রবাসী বাংলাদেশ সরকার গঠিত হয়। জানতে পারি মুক্তিযোদ্ধাদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে এবং অস্ত্র দেওয়া হবে ট্রেনিং এর পরে। আমরা ভারতে যাবার প্রস্তুতি নিলাম। প্রকৃত তারিখ মনে নেই, সম্ভবত এপ্রিল মাসের শেষের দিকে ভারতে রওনা হলাম ট্রেনিং এর জন্য। যদিও একসাথে যাবার প্রোগ্রাম ছিল কিন্তু গোপনীয়তার কারণে আমরা কয়েক দলে ভাগ হয়ে রওনা হলাম। প্রথম দলে ছিলেন রফিকুল আলম (তালম), গোলাম সরোয়ার (বুদো), ফজলুল হক, কে এম সিরাজুল ইসলাম (প্রাক্তন সেনা সদস্য), কে এম মোয়াজ্জেম হোসেন (কান্দল), সলিল কুমার চাকি, নির্মল কুমার, কে. এম. মকলেসুর রহমান (টিপু), দেলওয়ার হোসেন (দুলাল), শেখ শাহজাহান সহ আরও অনেকে। আমাদের গ্রুপে ছিলেন রোকনউদ্দিন বাচ্চু, সদর উদ্দিন খান, রবিউল আলম মজনু, নুরুল ইসলাম (দুলাল), মোশাররফ হোসন বকুল, খায়রুল বাসার বকুল সহ আরও অনেকে। আমাদের গ্রামে ভারতীয় প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত ১৩জন সহ মোট মুক্তিযোদ্ধার সংখ্যা ৪৫ জন। আমরা প্রথমে গেলাম শিকারপুর ট্রানজিট ক্যাম্পে, সেখানে আমাদের থাকার ব্যবস্থা হল। জানতে পারলাম ২দিন আগে আমাদের পূর্বতন গ্রুপ ট্রেনিং এ চলে গেছে। পরের ব্যাচ কবে যাবে ঠিক নেই। যাই হোক ওখানে ই পি আর ভাইদের তত্ত্বাবধানে পি.টি প্যারেড সহ শরীর চর্চার বিষয়ে ট্রেনিং নিতে শুরু করলাম। প্রায় দিন দশেক পর উচ্চ প্রশিক্ষণের জন্য একটি ব্যাচ রিক্রুটের জন্য লোক এল। আমরা সব এক লাইনে দাঁড়ালাম কিন্তু আমরা ৩ জন বাদ পড়ে গেলাম। আমাদের বয়স কম। দেখতেও ছোটখাটো আমাদের পরে নেওয়া হবে। ইতিমধ্যে বকুলের শরীর খারাপ করল, ঠান্ডা জ্বর হলো, ফলে ও আর থাকতে চাইলো না। বললো বাড়ি ফিরে যাব। বাধ্য হয়ে আমি এবং সদর বকুলকে নিয়ে বাড়ি ফিরে এলাম। আমাদের ট্রেনাররা আমাদের দায়িত্ব দিলেন এলাকার খবর সংগ্রহ করে আনার জন্য। গ্রামে ফিরে পালিয়ে থাকতে হলো। কারণ ইতিমধ্যে পাকসেনারা এলাকায় রাজাকার এবং শান্তি কমিটি গঠন করছে-তাদের সাহায্যের জন্য। অনেকে বাধ্য হয়ে রাজাকার বাহিনীতে যোগ দিয়েছে। অনেকে রাজাকার বাহীনিতে নাম লিখিয়ে হিন্দুদের বাড়ী ঘর লুট করছে বলে খবর পেলাম। সম্ভবত জুন মাসের দিকে আমার বড় ভাই-কে এম মোয়জ্জেম

সহ বুদো, তালম, ফজলুরা ট্রেনিং শেষ করে ফিরে এলো। ওরা সাথে করে নিয়ে এলো কিছু হ্যান্ড গ্রেনেড এবং ৩০৩ রাইফেলের গুলি। পরিকল্পনা হলো রাজাকার বা আর্মি ক্যাম্প বা টহলদার গ্রুপের উপরে গ্রেনেড চার্জ করে ওদের রাইফেল কেড়ে নিয়ে যুদ্ধ করা, এলাকার অবস্থা যাচাই করা এবং আরও মুক্তিযোদ্ধা সংগ্রহ করা। আমিও তাদের কাছ থেকে গ্রেনেড ছোড়া এবং পরবর্তীতে করণীয় বিষয়ে প্রশিক্ষণ নিলাম এবং আশরাফ সিদ্দিকি (পাবনায় বাড়ি) নামের ভারতের প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত একজন মুক্তিযোদ্ধার নেতৃত্বে খোকসা থানা রাজাকার ক্যাম্পে হামলা চালানোর জন্য রওনা দিলাম। ওই দিন আমাদের দুর্ভাগ্য যে আমাদের ছুড়ে দেওয়া গ্রেনেড বিস্ফোরিত না হওয়ায় আমরা ওদের চোখে ধরা পড়ে যাই।ওরা গুলি শুরু করে। আমরা অন্ধকারে বিভিন্ন দিকে ছুটে পালাই। সারারাত মাঠে ও ঝোপ জঙ্গলে ঘুরে ভোররাতে পাথরবাড়িয়া মসজিদের কাছে পৌছাই। মোয়াজ্জিন সাহেব বললেন, বাবা তুমি বাচ্চা ছেলে এখনই সরে যাও নইলে সকাল হলে রাজাকাররা তোমাকে ধরে নিয়ে যাবে। যাই হোক, তার দেখানো পথে আমাদের ক্যাম্পে ফিরে আসি বেলা ১২টার দিকে। তখনও আশরাফ ভাই ফিরে আসেনি। উনি এলেন সন্ধ্যা নাগাদ। ওই রাতেই আমরা আবার ভারতের দিকে রওনা দিলাম। পশ্চিমবঙ্গের করিমপুর ক্যাম্পে পৌছে আমাদের খোকসা কুমারখালী এলাকার এমপিএ জনাব মরহুম গোলাম কিবরিয়া সাহেবের দেখা পেলাম। সেই সাথে জনাব আহম্মদ আলী, মিয়া মমতাজ হোসেন সহ এলাকার বহুলোকের সাথে সাক্ষাত পেলাম যারা মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেওয়ার জন্য অপেক্ষা করছে। কয়েকদিন পর এ্যাডভোকেট এম এ বারী (বারী ভাই) সাহেব আমাদের ক্যাম্পে এলেন এবং আমাদের সবাইকে খুব শিঘ্রই ট্রেনিংএ পাঠানো হবে বলে জানালেন। জুন/৭১, মাসের শেষের দিকে আমাদের উচ্চতর প্রশিক্ষণের জন্য পাঠানো হলো। প্রথমে বাসে করিমপুর থেকে রানাঘাট। তারপর ট্রেনে শিয়ালদাহ। ইতিপূর্বে কখনও কলকাতা দেখি নাই। আমাদের কাছে সবই নতুন মনে হলো। ওখান থেকে হাওড়া। হাওড়া থেকে ট্রেনে দার্জিলিং রওনা দেবার সময়ই আমার প্রচন্ড জ্বর ছিল। শিয়ালদাহ ষ্টেশনে নামার পরে হোটেলে খেতে বসে পাশের টেবিলে একজনকে কাছিমের মাংস খেতে দেখে আমার শরীরটা যেন কেমন গুলিয়ে ওঠে। বমিবমি ভাব ছিলই হাওড়া থেকে ট্রেনে উঠার পর থেকেই বমি শুরু হলো। আমার বন্ধুরা বিশেষ করে বাচ্চু আর দুলাল যে কষ্ট সেদিন করেছে তা বলার নয়। দুর্বল হয়ে তাদের কোলের ওপরেই ঘুমিয়ে গেলাম। সকাল বেলায় দার্জিলিং পৌছালাম। ওখান থেকে সামরিক ট্রাকে করে উওরবঙ্গের জলপাইগুড়ি জেলার বাগডোগড়া এয়ারপোর্টের কাছে পাংগা ট্রানজিট ক্যাম্পে পৌছালাম, তখনও আমার প্রচন্ড জ্বর। পাংগা জায়গাটা একটু আশ্চর্য ধরনের। তাবুতে থাকি গরম কাল, কিন্তু সকালে দেখি তাবু ভেজা। পাশেই একটা ছোট নদী। বৃষ্টি হলে নদী উপচে পানিতে ভরে যায়। সাথে ছোট ছোট পাথর কুচি। আবার পানি কমতে



থাকলে পাথর কুচিও সরে যেতে থাকে। আরও একটা মজার বিষয় ওখানকার নদীতে কাপড় ধুলে এমনিই পরিস্কার হয়ে যায়। আমাদের ক্যাম্পের উত্তর-পশ্চিম পার্শ্বে নদী আর দক্ষিণ পার্শ্বে ছোট একটা বিমান বন্দর। ছোট ২টি বিমান প্রায় সময়ই ওখানে দেখা যায়। এর মধ্যে আমি কিছুটা সুস্থ হয়েছি। বন্ধুদের সাথে পিটি প্যারেডে অংশগ্রহণ শুরু করেছি। এখানে প্রায় ১০/১৫ দিন ছিলাম। এই পাঙ্গা ক্যাম্পের দায়িত্বে ছিলেন জনাব সিরাজুল আলম খান। এখানে এসে দেখা পেলাম আমাদের খোকসার জনাব আলাউদ্দিন খান, সাইদুর রহমান মন্টু ও জনাব তরিকুল ইসলাম (তরু) ভাইয়ের, এছাড়া কুমারখালীর আব্দুল হান্নান, হাবিব, জাফরি, সামসুল হুদা, বাবলু, মাহাবুব, খোকন, আমানুল কিবরিয়া, দৌলতপুরের জিয়ারুল ইসলাম, নুরুল ইসলাম (মন্টু) পাবনার ভুলু ভাই, লোকমান সহ আরও অনেকে। আমার অসুস্থতার সময় আমার সাথী বন্ধুরা সহ জনাব সিরাজুল আলম খান আমার যে সেবা যে যত্ন করেছেন তা আমি কোনদিন ভুলবো না। এই ট্রানজিট ক্যাম্প থেকে বিমানে আমাদের উত্তর প্রদেশের শাহরানপুর বিমান বন্দর হয়ে দেরাদুনের তান্দুয়া ট্রেনিং সেন্টারে নিয়ে যাওয়া হলো। এটা ভারতের চাকরাতা ক্যান্টনমেন্টের আওতাধীন একটি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র যা সমুদ্রপিঠ থেকে প্রায় ৮,০০০ ফিট উপরে অবস্থিত। জুলাই মাসেও এখানে প্রচন্ড শীত। তিনটা কম্বলেও শীত যায় না। জেলা শহর দেরাদুন আরও উপরে। চারিদিকে শুধু পাহাড় আর পাহাড়। আমার কাছে মনে হলো পাথরের দেশে এলাম। আমাদের ক্যাম্পের উত্তর পাশ দিয়ে দেরাদুন যাওয়ার রাস্তা। পাহাড়গুলো মনে হয় রাস্তার উপরে এখনই আছড়ে পড়বে। আমরা সকালে এই রাস্তায় দৌড়াতাম। নিচের দিকে যখন নামতাম ভালই লাগতো রাস্তা ঘুড়ে ঘুড়ে আমাদের ক্যাম্পের পূর্বপাশ দিয়ে নিচে নেমে গেছে। নিচ থেকে দেখে মনে হতো ঐতো দেখা যাচ্ছে। কিন্তু উঠতে আমাদের প্রায় দেড় দুই ঘন্টা লেগে যেতো। নিচের দিকে যতদুর দৃষ্টি যায় শুধু পাহাড় আর পাহাড়। আমাদের উপরে মেঘ নিচে মেঘ মাঝে মাঝে আমাদের ঘরের মধ্যেও মেঘ ঢুকে পরতো। তান্ডুয়া ট্রেনিং সেন্টারর দায়িত্বে ছিলেন মেজর চৌহান নামে একজন ভারতীয় মেজর। বাংলাদেশের পক্ষে দায়িত্বে ছিলেন জনাব হাসানুল হক ইনু ভাই। সাথে আরও ছিলেন জনাব মাহবুবুল হক, শরিফ নুরুল আম্বিয়া, আফজাল শরিফ প্রমুখ। আমাদের ব্যাচ নম্বর ছিল ৫(পাঁচ)। এখানে একদিন জনাব তোফায়েল আহমেদ আমাদের ক্যাম্প পরিদর্শন করেন ও আমাদের করণীয় সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন। সঙ্গে ছিলেন ভারতীয় জেনারেল উবান সিং। ট্রেনিং শেষে বিমানে দমদম বিমান বন্দর, কলকাতা হয়ে ব্যারাকপুর ক্যান্টনমেন্টে আসি। এখানে বিএলএফ দক্ষিণ-পশ্চিম রনাঙ্গণের প্রধান ছিলেন তোফায়েল আহমেদ আর নুর এ আলম জিকু তার ডেপুটি। এখানে আমাদের থানা ভিত্তিক একটা করে গ্রুপ করা হয়। প্রত্যেক গ্রুপের একজন কমান্ডার, ডেপুটি কমান্ডার ও একজন অর্গানাইজার নিয়োগ করা হয়। আমাদের খোকসা

থানা কমান্ডার হিসাবে জনাব আলাউদ্দিন খান ও ডেপুটি কমান্ডার হিসাবে জনাব রোকন উদ্দিন বাচ্চু এবং আমাকে অর্গানাইজার করা হয়। আমাদের অস্ত্র ও গোলাবারুদ সরবরাহ করা হয়। একরাত্রে আমরা বাংলাদেশের ভিতর প্রবেশ করি সেপ্টেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহে। খোকসা থানা ইউনিটে আমরা ছিলাম ৬জন। আমাদের কাজ ছিল স্থানীয় মুক্তিযোদ্ধাদের সংগঠিত করা, ট্রেনিং দেওয়া, অস্ত্র সংগ্রহ করা ও যুদ্ধ করা। আমরা প্রথমে আমবাড়িয়ায় ক্যাম্প করি। এরপর ভবানিগঞ্জ, মহিষবাথান, বড়ইচারা, শিমুলিয়া, শিতলডাঙ্গি, শ্যামপুর, মানিককাট, বিলজানি, বেতবাড়িয়া, একতারপুর, বনগ্রাম সহ বিভিন্ন জায়গায় আমাদের অস্থায়ী ক্যাম্প গড়ে তুলি এবং নতুন নতুন মুক্তিযোদ্ধাদের রিক্রুট করে ব্যাপক ট্রেনিং দেওয়া শুরু করি। এক দেড় মাসের মধ্যে আমরা প্রায় ১৫০জন মুক্তিযোদ্ধাদের প্রশিক্ষণ দেই। যাদের সবার নাম মনে নেই। তাদের মধ্যে যাদের নাম এই মুহূর্তে মনে পড়ছে, জনাব মোঃ আবেদ আলী, আজগর আলী, আঃ হামিদ, রিয়াজ উদ্দিন, অহিদুর রহমান, নয়ন খান, লোকমান হোসেন, মেজবাহউদ্দিন, হাতেম আলী খান, ছাবেদ, আলেফ আলী, ফজলু, আদম আলী, হাসান আলী, আঃ রাজ্জাক মঈন, হাবিবুর রহমান, মনজেল দেলওয়ার। জয়নাল, আকবার, রাজেক, কায়ছার, লোকমান, হাসনু ভাই, ছাত্তার ডাক্তার, ওহাব, হাবিবুর, নয়নখান, আকতার, রহমান, ছাত্তার মন্ডল, প্রমুখ। উপরোক্ত মুক্তিযোদ্ধাদের ট্রেনিং হতো গোপনে রাতের বেলায়। আমাদের থাকা খাওয়ার ব্যাপারে যারা বিশেষভাবে সহায়তা করেছেন তাদের মধ্যে চেয়ারম্যান সামসুদ্দিন খান, কে এম মহাসিন, আবুল হোসেন জোয়ার্দার, গোলাম ছরোয়ার পাতা, ডাক্তার আব্দুল ছাত্তার, হাসনু ভাই, আমানত আলী, মকবুল হেসেন বদু ডাক্তার, জালাল মিয়া, হাবিবর রহমান, কান্ত, মমতাজ বানু, লবু খাঁ উল্লেখযোগ্য। ট্রেনিং এর পর আমাদের প্রধান কাজ হলো অস্ত্র সংগ্রহ। ইতিমধ্যে আমাদের সাথে যোগ দিয়েছেন জনাব সাইদুর রহমান মন্টু, জনাব তরিকুল ইসলাম (আমাদের আগের ব্যাচে ট্রেনিং নিয়েছে), কমান্ডার জনাব আকবার আলী (যুদ্ধাহত), জনাব ওমর আলী। এর মধ্যে খবর পেলাম ওসমানপুরে একটি রাজাকার ক্যাম্প আছে। তাদের কাছে বেশ কয়েকটা রাইফেল আছে। উক্ত ক্যাম্পে রেড দেওয়ার প্রোগ্রাম করলাম। আমরা ওদেরকে সারেন্ডার করার সুযোগ দিলে ওরা সারেন্ডার করলো। আমরা বেশ কয়েকটা অস্ত্র পেলাম। সম্ভবত এটা নভেম্বর মাসের ১ম সপ্তাহ। এর তিন দিন পর আমরা শীতলডাঙ্গি ক্যাম্পে পাক আর্মি এবং রাজাকার বাহিনী দ্বারা ঘেরাও এর মধ্যে পড়ে গেলাম। পুরো এলাকা ঘিরে ফেলেছে ওরা। কোন দিক দিয়ে বের হবার পথ নেই। আমি, সদর, মজনু ও দুলাল ছিলাম ক্যাম্পে। প্রায় ২০০ পাকি আর্মি ও রাজাকারের বিরুদ্ধে আমরা ৪ জন। কিছুই করা সম্ভব নয়। তাই অস্ত্রগুলি লুকিয়ে আমরা ধান ক্ষেতে কাজে লেগে গেলাম। স্থানীয় লোকদের সহায়তায় আমরা সেদিন বেঁচে যাই। নভেম্বর মাসের ৩০ তারিখে আমরা মোরাগাছা রাজাকার



ক্যাম্পে আক্রমণ চালাই। কিন্তু ক্যাম্পটা দখল করা সম্ভব হয় নাই। এখানে প্রায় ৫০ জন রাজাকার থাকতো। কুমারখালী থেকে আর্মি মুভ করায় এবং আমাদের গুলি শেষ হয়ে যাওয়ায় আমরা ফিরে আসি। খোকসা থানা দখলের যুদ্ধঃ মোরাগাছা রাজাকার ক্যাম্প আক্রমনের পরের দিন খবর পাওয়া গেল ওখানকার ক্যাম্প গুটিয়ে খোকসা জানিপুর হাইস্কুলে স্থানান্তর করা হয়েছে। তখন আমাদের থানা কমান্ডার জনাব আলাউদ্দিন খান আমাকে ডেকে বললেন খোকসা থানা দখল করতে হবে সবাইকে প্রস্তুতি নিতে বলেন। আমরা প্রস্তুতি নিতে শুরু করলাম। কমান্ডার সাহেব মাছপাড়া এলাকার বিএলএফ কমান্ডার আব্দুল মতিন কুমারখালীর কমান্ডার লুৎফর রহমান, গড়াই নদীর অপর পাড়ে অবস্থান করছিলেন তাকে খবর দিলেন। খোকসার গেরিলা কমান্ডার মোঃ আকবর আলি, কমান্ডার আব্দুল মালেক, আমবাড়ীয়ার গেড়িলা কমান্ডার খলিলুর রহমান সহ কুমার খালির বিএলএফ কমান্ডার হাবিবকে খবর পাঠালেন এবিষয়ে পরামর্শ করে সময় নির্ধারন করার জন্য। সকলেই ৪ঠা ডিসেম্বর খোকসা থানা আক্রমনের প্রস্তুতি গ্রহনে রাজি হলেন। ৩রা ডিসেম্বর সন্ধ্যাবেলায় আমরা বেতবাড়িয়া সাত্তার ডাক্তার এর বাড়ি থেকে কমলাপুরে আবুল জোয়ার্দার এর বাড়ীতে যাচ্ছিলাম একটা ব্যাচের ট্রেনিং দেয়ার জন্য। পথিমধ্যে সাত্তার ডাক্তার আমাদের থামালেন এবং জানালেন আব্দুল হাই নামে একজন রাজাকার কমান্ডার আমাদের কাছে সারেন্ডার করতে চায়। আগে থেকেই এ বিষয়ে আলোচনা চলছিল। তিনি আরও জানালেন ৭টা রাইফেল ও ৭জন সহযোগী সহ সে আজ রাতেই সারেন্ডার করবে যদি আমরা রাজি হই। আমরা রাজি হলে ঐদিন রাত ১০টার দিকে ওদেরকে নিয়ে এলেন। আমরা ওদের অস্ত্রগুলো জমা নিয়ে ওদের কাছ থেকে থানা ও রাজাকার ক্যাম্পের তথ্য পাওয়ার পরে সিদ্ধান্ত হলো আজ রাত্রেই খোকসা থানা আক্রমণ করতে হবে। আলাউদ্দিন ভাই আমাদের বিভিন্ন গ্রুপের কাছে খবর পাঠালেন। আক্রমনের সময় ঠিক হলো রাত ১২.০১ মিনিটে। সাইদুর রহমান মন্টু ও তারিকুল ইসলাম তাদের গ্রুপসহ ছিলেন বেতবাড়িয়া এলাকায়। বাচ্চু, দুলাল, মজনু, ছিলেন মানিক, কাঠ যতীন দত্তের বাড়ি। আকবর কমান্ডার ও ওমর আলি ছিলেন একতারপুর। সিমুলিয়াতে ছিলেন মেজবাহ উদ্দিন ও হাতেম আলি খান। এদের সকলকে খবর দেওয়া হলো, পাঠানো হলো স্থানিয় ভাবে ট্রেনিং দেওয়া কয়েকেজন মুক্তিযোদ্ধাকে। আকতার, ছবেদ আলী, আদম আলী ও জয়নাল আবেদিনকে পাঠানো হলো। যুদ্ধের জন্য প্লান করা হলো একই সাথে স্কুলে এবং থানায় আক্রমণ করা হবে। থানার পূর্বপ্বার্শে কমান্ডার আকবর দক্ষিন-দক্ষিন-পশ্চিমের কমান্ডার সাইদুর রহমান মন্ঠু এবং রোকন উদ্দিন বাচ্চু দুলাল ও মজনুকে। আর জানিপুর হাইস্কুলের দায়ীত্ব দেওয়া হলো আমাকে। আমি প্রথমে গ্রেনেড চার্জ করবো তারপর ২টি টিএনটি স্লাব বাস্ট করা হবে। উদ্দেশ্য রাজাকারদের ঘাবড়ে দেওয়া। আমি ক্রল করে স্কুলের উত্তর দিক থেকে পুকুরের পাড় দিয়ে একদম স্কুলের পেছনে

পৌছেগেলাম। আমার সাথে স্থানীয়ভাবে ট্রেনিং দেয়া ৩জন মুক্তিযোদ্ধা আলেফ, ফজলু ও ছবেদ আলী। আলাউদ্দিন ভাই স্কুলের পূর্বপাশের বাড়ীগুলোর পেছনে পজিশন নিয়েছেন। স্কুলে পৌঁছে আমার সন্দেহ হল এখানে সম্ভবত কেউ নাই। আসলেও তাই। স্কুলের সব রাজাকারকে থানায় নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। যাই হোক ক্রল করে আবার আলাউদ্দিন খানের কাছে গেলাম এবং সব জানালাম। ওখানে তখনই সিদ্ধান্ত হলো স্কুলে টিএনটি স্লাবের বিস্ফোরন ঘটানো হবে এবং থানার উত্তর পার্শ্বে সেন্টি বক্সের গ্রেনেড চার্জ করা হবে তার পরে সবাই এক যোগে তিন দিক থেকে থানার উপরে গুলি চালানো হবে। খোকসা থানার উত্তর গেটের পার্শ্বে একটি সেন্টি পোষ্ট ছিল। আর একটি সেন্ট্রি পোষ্ট ছিল উত্তর পূর্ব কোনায়। সেন্ট্রি পোষ্টের নিচে নিচু খাল মতো তার পরেই থানার পূর্ব পার্শ্বের উত্তর দক্ষিণ রাস্তা। রাস্তার পূর্ব পার্শ্বে আকবর আলীর পজিশন। থানার পশ্চিম পার্শ্বে পুকুর। পুকুরের পাড় দিয়ে কাটাতারের বেড়া। আমি আর আলেফ ক্রল করে স্কুলের পাশ দিয়ে থানার উত্তর পার্শ্বের গেটের সামনে পজিশন নিলাম। রাস্তার পাশেই খেলার মাঠ। রাস্তা থেকে দেড় ফুট নিচু। স্কুলে ২টা টিএনটি স্লাব বিস্ফোরনের জন্য সেট করে রেখে এসেছি। প্রথম স্লাবটির বিস্ফোরন ঘটলো ঠিক রাত ১২ঃ০১ মিনিটে। সঙ্গে সঙ্গে আমি আর আলেফ আমাদের গ্রেনেড দুইটা ছুড়ে মারলাম। শুরু হল যুদ্ধ। প্রায় ঘন্টাখানেক উভয়পক্ষে প্রচন্ড গোলাগুলি চললো। আমি দেখলাম এদিক দিয়ে ভেতরে যাওয়া সম্ভব নয় ভেতরে ঢুকতে না পারলে ওদেরকে সারেন্ডার করানো যাবেনা। আমাদের কাছে খবর ছিল থানা বিল্ডিংয়ের পূর্ব পার্শ্বের বাসায় থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আব্দুল গনি থাকে। তাই ওখান থেকে ক্রলিং করে থানার পূর্ব উত্তর পার্শ্বের সেন্ট্রি পোষ্টের কাছে এলাম, এখানে পূর্ব পার্শ্বের রাস্তার ঢালে পজিশন নিয়ে গুলি করছিল, কমন্ডার আকবর, ওমর সহ কয়েকজন। রাস্তার পশ্চিম পাশে ১০ফুট চওড়া একটা খাল, তারপর থানার বাউন্ডারি। তারকাঁটা ঘেরা। ওখানেই উত্তর পূর্ব কোণের সেন্ট্রি পোষ্ট। সেন্ট্রি পোষ্ট থেকে ২ জন রাজাকার গুলি করছিল। আমি আমাদের লোকদের আমার প্লানের কথা বললাম, ওরা রাজি হল। তবে সবার আগে এই পোষ্টটা আমাদের দখল করতে হবে। আমাদের থেকে পোষ্টার দূরত্ব ২৫-৩০ ফুট। আমরা ওদেরকে গুলি বন্ধ করে সারেন্ডার করার প্রস্তাব দিলাম। জবাবে ওরা গুলি করলো। আমার ভাগ্য ভালো। পাশ থেকে কমান্ডার আকবর আমার হাত ধরে টান দিয়েছিল। আমি পড়ে গেলাম এবং বেঁচে গেলাম। মাথায় পাশ দিয়ে একটা গুলি বেরিয়ে গেল। কথা বলার সময় আমার মাথাটা একটু উঁচু হয়েছিল। আমাদের লোককে কভারিং ফায়ার দিতে বলে আমি একটু দক্ষিণে সরে গেলাম এবং রাস্তা পার হয়ে খালের মধ্যে দিয়ে আবার সেন্টি পোষ্টের একদম গোড়ায় চলে এলাম। আমার সাথে হিজলা বটের ফজলু। আমার থেকে সেন্ট্রি পোষ্টের দুরত্ব ৩/৪ ফিট। ওদেরকে বললাম তোমরা সারেন্ডার না করলে তোমাদের পোষ্টটা আমরা এখনই উড়িয়ে দেব। ওরা



ভয় পেয়ে গেল। ওদের রাইফেল গুলি সেন্ট্রি পোষ্টের বাইরে ফেলে দিল। এখানে ওরা সারেন্ডার করায় আমাদের থানায় ভেতরে ঢোকা সুবিধা হয়ে গেল। আমার পেছন থেকে কোয়াটারগুলোর জানালা লক্ষ করে আমাদের বন্ধুরা কভারিং ফায়ার শুরু করল আর আমরা দু'জন ক্রলিং করে চলে এলাম থানার পেছনে গণি দারোগার বাসার সামনে। দুই বিল্ডিং এর মাঝখানে হওয়ায় এখানে কোন দিক থেকেই গুলি আসার সম্ভাবনা নেই। লাথি দিয়ে দরজা ভাঙ্গার পরে এক পশলা ষ্টেন গানের গুলি ছুড়ে গণি দারোগাকে সারেন্ডার করতে বললাম। বাসার ভেতরে ঢুকলাম আমি আর ফজলু। আমার হাতে ষ্টেন গান আর ফজলুর হাতে ৩০৩ রাইফেল। দুই হাত তুলে গনি দারোগা বেরিয়ে এলো। সাথে থানার সি.ও সাহেব ও একজন রাজাকার। ফজলু বাসা সার্চ করে বলল আর কেউ নাই। আমি গনি দারোগাকে বললাম সবাইকে সারেন্ডার করতে বলেন। আমরা কাউকে মারবো না। ওদের তিন জনের পিছনে অস্ত্র ঠেকিয়ে থানার দিকে নিয়ে গেলাম। চিৎকার করে আমাদের লোককে গুলি বন্ধ করতে বললাম। গণি দারোগা থানার সবাইকে সারেন্ডার করতে বললেন। ওরা সবাই সারেন্ডার করল। ফজলু "জয় বাংলা" বলে চিৎকার করে উঠল। তিন দিক থেকে আমাদের সহযোদ্ধারা জয় বাংলা বলে স্লোগান দিতে লাগল। এখান থেকে আমরা ১৫০টি অস্ত্র উদ্ধার করি। তখন বাজে রাত সাড়ে তিনটা। উদ্ধারকৃত অস্ত্র ও গণি দারোগাসহ কয়েকজন রাজাকারকে বন্দি করে আমরা আমাদের মানিককাট ক্যাম্পে চলে যাই। অন্যান্য রাজাকারদের আমরা ছেড়ে দেই। ক্যাম্পে যেতেযেতে আমাদের প্রায় সকাল সাড়ে চারটা বেজে যায়। এই সব অস্ত্র আমাদের যে সমস্ত প্রশিক্ষনপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধা ছিল-যাদেরকে ইতিপূর্বে অস্ত্র দিতে পারি নাই তাদের মধ্যে বিলি করা হয় এবং তিনটা আলাদা কোম্পানী গঠন করা হয়। আমার দায়িত্ব দেওয়া হয় ৫০জনের একটা কোম্পানীর এবং বলা হয় খোকসা ষ্টেশনে, শোমসপুর হাইস্কুলে যে পাকিস্তানি আর্মি ক্যাম্প আছে তা আজ রাতেই আক্রমণ করতে হবে। আমার কোম্পানী সহ আমাকে মির্জাপুরে যেয়ে অবস্থান নিতে বলা হয়। আমি মির্জাপুরে এসে সারারাত যারা যুদ্ধ করেছে তাদেরকে বিশ্রাম নিতে বলি ও অন্যান্যদেরকে পাহারায় নিয়োগ করি। বেলা ১২টার দিকে একজন মুক্তিযোদ্ধা আমাকে ডেকে তোলেন এবং জানান খোকসা থানায় পাক আর্মি এসেছে এবং তারা কিছু বাড়ি ঘর পুড়িয়ে দিয়েছে। আমরা কয়েকজন বসে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নিলাম খোকসা থানা থেকে পাক আর্মি ফেরার পথে রাজিনাথপুর এলাকায় আমরা ওদের এ্যাম্বুস করবো। সবাই অস্ত্রসস্ত নিয়ে নির্দিষ্ট এলাকার দিকে রওনা হলাম। কিন্তু রাজিনাথপুরে পৌঁছে দেখলাম পাক আর্মিরা ইতিমধ্যেই রাজিনাথপুর পার হয়ে খোকসা ষ্টেশনে পৌঁছে গেছে। তখন বাজে বেলা একটা। ওখান থেকে থানা কমান্ডার আলাউদ্দিন ও অন্যান্য সকলকে খবর পাঠালাম আজ সন্ধ্যায় শোমসপুর আর্মি ক্যাম্প আক্রমণ করা হবে। আমরা ওখানেই পজিশন নিলাম। সন্ধ্যা ছয়টার দিকে খোকসা

রেলষ্টেশন ও শোমসপুর হাইস্কুলে একযোগে আক্রমণ করা হবে এইভাবে প্লান করে আমরা শোমসপুর ক্যাম্পের দিকে এগিয়ে গেলাম। ষ্টেশনের কাছাকাছি এসে খবর পেলাম বিকেল পাঁচটার দিকে আর্মিরা সব তাড়াহুড়া করে বিশেষ একটা ট্রেনে করে কুষ্টিয়ায় পালিয়ে গেছে। এই এলাকায় পূনরায় আর্মি আসার একমাত্র ব্যবস্থা রেললাইন। তাই আমরা পশ্চিমে সুলতানপুর ব্রিজ পূর্বে সাজুরিয়া ব্রিজ উড়িয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিলাম। ৬ই ডিসেম্বর খবর পেলাম শৈলকুপা থানা মুক্তিযোদ্ধারা দখল করে নিয়েছে এবং পাক আর্মি পালিয়ে গেছে। পান্টি, সান্দিয়ারা প্রভৃতি জায়গা আমাদের দখলে চলে আসে। এই সময় খবর পেলাম রাজবাড়ী থেকে এক ট্রেন ভর্তি মিলিটারি কুষ্টিয়ায় যাবে। সাঁঝুরিয়া ব্রিজের কাছে মুক্তিযোদ্ধারা ব্রিজ উড়িয়ে দেয় প্রচন্ড গোলাগুলি হয় ফলে পাক আর্মি আবার রাজবাড়ি ফিরে যায়। এই সময় আমরা সুলতানপুর ব্রিজ উড়িয়ে দিয়ে কুমারখালীর দিকে রওনা দেই। পান্টির জাহিদ হোসেন জাফর, সান্দিয়ারার কমান্ডার লুৎফর, কুমারখালীর কমান্ডার রাজ্জাক, হাবিব, খলিল, সাইদুর রহমান মন্টু বিভিন্ন দিক থেকে এক যোগে কুমারখালী থানা ও রাজাকার ক্যাম্প এর উপরে আক্রমণ চালায়। আমি রেল লাইন ধরে পূর্ব পাশ থেকে আক্রমণ শুরু করি। ৬ই ডিসেম্বর দুপুরের মধ্যেই আমরা কুমারখালী দখল করি। রঞ্জু আহমেদ এবং আব্দুল জলিল রেল ষ্টেশনের পেছন থেকে আক্রমণ করে। পাকবাহিনী সর্বাত্মক আক্রমণ দেখে ভয়ে কুষ্টিয়ার দিকে পালিয়ে যায়। কিছু রাজাকার কুন্ডুপাড়ার মনসুর ডাক্তার, নজরুল মাষ্টার, ফিরোজ প্রমুখের বাড়িতে আশ্রয় নিয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের উপরে গুলি বর্ষণ শুরু করে। এখানে মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে তাদের প্রচন্ড যুদ্ধ হয়। এক সময় ওরা পালিয়ে যায়। আমরা কুমারখালী শহর পুরোপুরি দখল করি। এই দিন বিকেলে ভারতীয় বিমান বাহিনীও বেশ কয়েকবার পাক বাহিনীর উপরে বোমা বর্ষণ করে। ৭ই ডিসেম্বর রাতে বদর কমান্ডার ও মোকাদ্দেছ কমান্ডার নেতৃত্বে কুমারখালী কুষ্টিয়ার মাঝে চড়াইকোল অবস্থান নেয় এবং হাতিখোলা রেল সেতুটি বিস্ফোরকের সাহায্য উড়িয়ে দেয়। যাতে পাক সেনারা আর পূর্বদিক ফিরে আসতে না পারে। ৯ই ডিসেম্বর কুমারখালীর সকল এলাকা শত্রু মুক্ত হয়। খোকসা, কুমারখালী, শৈলকুপা, জগতি, মিরপুর, হরিপুর, কয়া, কালোয়া শত্রুমুক্ত হলেও কুষ্টিয়া জেলা শহর তখনও পাকবাহিনীর দখলে। সকল এলাকার মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডারগণ নিজ নিজ দলসহ কুষ্টিয়ার দিকে রওনা দেন। কুষ্টিয়া মুক্ত করতে বিরাট ত্যাগ স্বীকার করতে হয় মুক্তি ও মিত্রবাহিনীকে। মিত্র বাহিনীর যুদ্ধ বিমান ও ট্যাংক ধ্বংস হয় এই যুদ্ধে। দুই শতাধিক ভারতীয় সৈন্য সহ ব্যাপক সংখ্যাক সাধারণ মানুষ ও মুক্তিযোদ্ধা শহীদ ও গুরুতর আহত হয় ১১ই ডিসেম্বর কুষ্টিয়া শত্রুমুক্ত হয়। ১৬ই ডিসেম্বর পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ঢাকাতে আত্মসর্মপণ করে। আমাদের বিজয় হয়।

## বীর মুক্তিযোদ্ধা শেখ মুহাম্মদ ইসহাক

**আলিপুর, ফরিদপুর**

বঙ্গবন্ধুর ব্যাক্তিগত ফটোগ্রাফার জনাব মূসা আহমেদ ২৭ শে মার্চ, ১৯৭১ ঢাকা থেকে ফরিদপুরে আসেন পায়ে হেটে ও নৌকাযোগে বহুকষ্ট করে। কমলাপুরের সালাউদ্দীন আহমেদ মনির ছোট ভাই বকু ভাইয়ের বন্ধু হিসেবে (সালাহউদ্দীন আহমেদ মনি এবং বকু ভাই আমাদের সাবেক সংসদ সদস্য মরহুম ঈমাম উদ্দীন আহমেদ এর চাচাতো ভাই) তাদের বাড়ীতে আসেন। আওয়ামী পরিবারের লোক হিসেবে তখন তারা আত্মগোপনে অবস্থান করছিলেন। সালাহউদ্দীন আহমেদ মনি আমার ভগ্নিপতি। তিনি তাঁকে রাত্রে আমাদের বাড়ীতে নিয়ে আসেন। আমি সাধ্যমত তাঁর সেবা যত্ন করি। পরের দিন ২৮শে মার্চ, ১৯৭১ তিনি ভারতের উদ্দেশ্যে যাত্রা করবেন। তাই তাঁর বহনকৃত কিছু জিনিসপত্র আমার নিকট গচ্ছিত রেখে যেতে চাইলেন। একটি ২ ফিট লম্বা ও ১.১/২ ফিট চওড়া এবং ৩ ইঞ্চি গভীর স্টিলের বাক্স ভর্তি কিছু ছবির ফ্লিমের নেগেটিভ এবং বঙ্গবন্ধু ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষণের ২টি রেকর্ড ও নানাবিধ মূল্যবান ডকুমেন্টস সহ বাক্সটি আমার নিকট রেখে যেতে চাইলেন। আমি দ্বিধা দ্বন্দ্বের ভিতর রাজি হয়ে যাই। আমার ছোট ভাইয়ের নামও মুসা বলে তিনি আমাকে ভাই বলে সম্বোধন করেন। ফরিদপুরে তখনও পাক বাহিনী প্রবেশ করে নাই। মুলত বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নির্দেশ মতোই সারা দেশ পরিচালিত হচ্ছে, ফরিদপুর ও তার ব্যাতিক্রম নয়। তখন রাজেন্দ্র কলেজ, স্টেডিয়াম ময়দানসহ বিভিন্ন স্থানে স্বাধীনতার মূলমন্ত্রে দীক্ষীত হয়ে সামরিক প্রশিক্ষণ গ্রহণ চলছে। চারদিকে তখন থমথমে অবস্থা বিরাজ করছে, কখন কি ঘটে কিছু বলা যায় না। আমার নিকটে গচ্ছিত বাক্সটি আমি ঘরের আলমারির মধ্যে সযত্নে রেখে দেই। মুসা ভাই ভারতের উদ্দেশ্যে চলে গেলেন। যাবার আগে আমার পিতার পা ছুয়ে দোয়া চাইলেন। আমিও আল্লাহর নিকট কামনা করলাম মুসা ভাই যেন সহি-সালামতে ভারতে প্রবেশ করতে পারেন। ২১ শে এপ্রিল, ১৯৭১ যখন পাক বাহিনী ঘর বাড়ী জ্বালিয়ে মর্টারের গোলা নিক্ষেপ করে ফরিদপুর শহরের প্রান্ত সীমানায় এসে পড়েছে, প্রাণ বাঁচাতে শহরবাসী দিক-বিদিক ছোটাছুটি করছে; তখন আমার

একমাত্র চিন্তা হল আমি কি করে মুসা ভাই প্রদত্ত বঙ্গবন্ধুর মহা মূল্যবান ডকুমেন্টস রক্ষা করব। আমি আমাদের শোবার ঘরের খাটের নিচে পলেথিন মুড়িয়ে বস্তা দিয়ে জড়িয়ে মাটি খুঁড়ে মাটির নিচে পুতে ফেলি এবং ঘর লেপে মুছে স্বাভাবিক রূপদিয়ে ঘর তালা বন্ধ করে পরিবারের অন্যান্য সকল সদস্য সহ আমরা চর এলাকা আদমপুর গ্রামের এক আত্মীয় বাড়ীতে আশ্রয় নেই। পরিবারের সকলককে সেখানে রেখে আমি আমাদের ফরিদপুরে মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে বিভিন্ন ভাবে দেশের শত্রু নিধনের কাজে লেগে পারি। সেখানে দীর্ঘ ২১ দিন অবস্থান শেষে শহরের অবস্থা যখন স্বাভাবিক হয়ে তখন আমি আমার পরিবারের সকলকে নিয়ে নিজ বাড়ীতে ফিরে এলাম। বাড়ীতে আসার পর বাক্সটি মাটির নিচ হতে আলো বাতাসে রেখে এবং তালের পাখা দিয়ে বাতাস করে এর আদ্রতা ফিরিয়ে এনে আলমারির মধ্যে পুনরায় তুলে রাখি। ১৯ মে, ১৯৭১ রাতে মুসা ভাই ভারত হয়ে পুনরায় আমাদের বাড়ীতে আসেন। ভারত হতে এক ব্যাচ মুক্তিযোদ্ধা বাংলাদেশে প্রবেশ করে তিনিও সেই দলের সঙ্গে বাংলাদেশে চলে আসেন এবং এক ব্যাগ গ্রেনেড নিয়ে আসেন এবং তার সঙ্গে একটি স্টেনগানও ছিল। দীর্ঘ পথ হেটে আসার ফলে তাঁর পা দুটি ফুলে গিয়েছিল; ওনার সাহস দেখে তখন আমি আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিলাম। একদিন আমাদের বাড়ীতে আত্মগোপন থেকে বিশ্রাম নিয়ে পরের দিন তিনি গ্রেনেডের ব্যাগ সহ ঢাকার উদ্দেশ্য রওনা হন। ঢাকায় ৪/৫ দিন অবস্থান করে আবার তিনি আমাদের বাড়ীতে চলে আসেন। রাত্রে থেকে আবার পরের দিন ভারতের উদ্দেশ্য রওনা দেন। আবার ভারতের যাওয়ার আগে আমি তাকে বলি যে, মুসা ভাই আমাদের এলাকায় স্বাধীনতার পক্ষের লোক খুবই কম। কেউ যদি আমার কাছে আপনার গচ্ছিত ডকুমেন্টের কথা জানতে পারে তাহলে আমাকে প্রাণে মেরে ফেলে এগুলো ছিনিয়ে নিতে পারে। আমি কিভাবে তখন আপনার দেয়া আমানত রক্ষা করব? তখন তিনি তাঁর কাছে থাকা স্টেনগানটি আমার নিকট দিয়ে যান আমার আত্মরক্ষার জন্য। দীর্ঘদিন মুসা ভাইয়ের সঙ্গে আমার আর কোন যোগাযোগ ছিল না। ১৬ ডিসেম্বর দেশ স্বাধীন হওয়ার পরে ২০ ডিসেম্বর সর্ব শেষ তিনি আমাদের বাড়ীতে আসেন এবং আমার নিকট হতে তাঁর সেই মহামূল্যবান বাক্সটি ফেরৎ নেন এবং আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরে আনন্দে কেদে ফেলেন। তিঁনি বলেন বঙ্গবন্ধুর রেডিও টিভিতে প্রচারিত সকল ডকুমেন্টস, মূল্যবান কাগজ, দলিলপত্র এবং স্থির চিত্রের ফ্লিমসহ ৭ মার্চের এতিহাসিক ভাষণের সবকিছু পাক বাহিনী এবং তাদের এদেশীয় দোসররা ধ্বংস করে ফেলেছে। আপনার নিকট রক্ষিত ডকুমেন্টটি একমাত্র সম্বল যা হতে হাজার হাজার কপি তৈরী করা যাবে, তিনি এটাও বলেছিলেন বঙ্গবন্ধু



দেশে ফিরলে তাঁর সঙ্গে আপনার পরিচয় করিয়ে দিব। আমি যখন বীর মুক্তিযোদ্ধা সালাহউদ্দীন আহমেদ মনির নেতৃত্বে ঢাকা স্টেডিয়ামে অস্ত্র জমা দিতে যাই তখন ঢাকা স্টেডিয়ামে বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে মুসা ভাইকে দেখতে পেয়ে আমি আনন্দে আত্মহারা হয়ে আবেগের বশে তাঁর নিকট ছুটে যাই। অত্যন্ত ব্যাস্ত থাকায় এবং নিরাপত্তাজনিত কারণে তখন আমাকে সময় দিতে না পেরে রাত্রে কোথায় থাকব তা জানতে চান? আমরা ক্রীড়া ভবনে অবস্থান করছি বলে তাকে জানাই। তিনি রাতের বেলা আমার সঙ্গে দেখা করতে আসেন ও আমাকে অনেক আদর যত্ন করেন এবং কৃতজ্ঞতা স্বরূপ নিজ হাতে আমাকে মুজিব বাহিনীর সার্টিফিকেট আমার হাতে তুলে দেন। যা আজও আমি অতি যত্ন সহকারে আগলে রেখেছি। নির্মম হলেও সত্য আমার প্রাণাধিক প্রিয় মুসা ভাই ইতিমধ্যে পৃথিবী ছেড়ে চলে গেছেন। তার কথা আমার খুব মনে পড়ে; মনে পড়ে সেই দুর্বিসহ বিভীষিকাময় ভয়াল দিনের কথা। আমি তাঁর আত্মার মাগফেরাত কামনা করি ও আল্লাহর নিকট দোয়া প্রার্থনা করি তিনি যেন দেশের এই অকুতোভয় বীর সৈনিককে বেহেস্ত নছিব করেন। মাঝে মধ্যে ভাবতে ভাল লাগে আমি সেই ব্যাক্তি; আমি আমার জাতির পিতার মহা মূল্যবান ৭ মার্চের ভাষণের দলিল নিজের জীবন বাজি রেখে রক্ষা করার সুযোগ পেয়েছিলাম। নিজেকে গর্বিত মনে করি এই ভেবে যে, আমার জন্যই বর্তমান প্রজন্ম এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্ম বঙ্গবন্ধুর দেশের জন্য যে ত্যাগ যে ভূমিকা তাঁর সঠিক ইতিহাস জানতে পারবে। জয় বাংলা জয়বঙ্গবন্ধু। মুক্তিযোদ্ধা শেখ মোঃ ইসহাক ধর্ম বিষয়ক সম্পাদক ফরিদপুর জেলা আওয়ামীলীগ সাধারণ সম্পাদক সেক্টর কমান্ডার ফোরাম '৭১ উপজেলা সদর, ফরিদপুর।

## যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধা গাজী মাসীহুর রহমান

**ছোট জীবন নগর, চাটখিল, নোয়াখালী**

১৯৭১ সালের ৭ই মার্চের ভাষণ শোনার জন্য জালাল আহাম্মদ ও জি এম রুহুল আমীন সহ বাস ভাড়া করে ঢাকা যাই। বঙ্গবন্ধুর বাড়ীর সামনে বাস রাখি, বঙ্গবন্ধু সকলের সাথে করমর্দন করেন। ১৯৭১ সালের ১০ই মার্চ দেশে ফিরে আসার আগে রাজ্জাক ভাই ও সিরাজুল আলম খানের সাথে দেখা করি। ওনারা আমাকে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হতে বলেন। ২১ মার্চ মল্লিকার দীঘির পার এক্স আর্মি আহমদ উল্লাহকে দিয়ে আমার জনকল্যাণ সমিতির সদস্য ও কিছু ছাত্র (প্রায় ৩৫জনকে) ট্রেনিং দেওয়াই। তারপর খিল পাড়া হাইস্কুল মাঠে সুবেদার নজির মিয়াকে দিয়ে প্রায় ৪৫ জন জোয়ান ট্রেনিং নেয়। ২৮ মার্চ প্রথম ফেনীতে পাক আর্মি আসে খাজু মিয়ার ডাকে সাড়া দিয়ে ওখানে প্রথম আমরা যুদ্ধ শুরু করি ১৫ জন। আমাদের আর্মি সহ আমরা বিল্ডিংয়ের নিচে রেল লাইনের স্লিপারে আগুন ধরিয়ে দেই। তারপর পাক আর্মি লাফ দিয়ে পড়লে ৯জনকে হত্যা করা হয়। বাকিরা পলায়ন করে। তারপর আমরা ট্রেনিংয়ের জন্য দেরাদুনের তান্দুয়া যাই। আমি তান্দুয়ার ২য় ব্যাচ, ওখান থেকে এক্সপ্লুসিভ ও এল এম জি, এস এল আর, এসএমজি দিয়ে আমাকে গ্রুপ কমান্ডার করে পাঠায়। আমি আমার কাকা সুবেদার ওয়ালি উল্লাহ বীর বিক্রমসহ আমরা এক যোগে বগা দিয়ে সোনাইমুড়ি কাজীর দীঘির পার, মান্ডারি ও রামগঞ্জ সরাসরি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করি।

## বীর মুক্তিযোদ্ধা মো. শামসুল হক

**কামাত আঙ্গারীয়া, ভুরুঙ্গামারী, কুড়িগ্রাম**

আমি মুক্তিযোদ্ধা মো. শামসুল হক। অনেক স্বপ্ন নিয়ে যুদ্ধ করে দেশ স্বাধীন করেছি। স্বাধীনতার সময় আমার যুদ্ধকালীন অভিজ্ঞতা, প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তি এবং স্বপ্ন নিয়ে কথা বলছি আমি ১৯৪৮ সালের ১২ই মার্চ কুড়িগ্রাম জেলার ভূরুঙ্গামারী সদর থানায় জন্মগ্রহণ করি। আমার পিতা মৃত সমসের আলী মন্ডল ও মাতা মৃত জোবেদা খাতুন দম্পতির নয় ছেলেমেয়ের মধ্যে আমার ৫ ভাই মহান স্বাধীনতার যুদ্ধে অংশগ্রহণ করি। আমি এক মেয়ে ও এক ছেলের জনক। ১৯৭১ সালে শেখ মুজিবের ৭ই মার্চের "জয়বাংলা" ভাষণ শুনে পাকিস্তানের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে জয়বাংলার জন্য জীবন বাজি রেখে স্বাধীনতার জন্য কাজ শুরু করি। আমি মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করে প্রশিক্ষণ নেই ৬ নং সেক্টরের অধীনে সাব সেক্টর সাহেবগঞ্জ ক্যাপ্টেন নওয়াজেশের নেতৃত্বে সেখানে প্রশিক্ষণ নেই ও তার নির্দেশেই কাজ করি। আমরা স্বাধীনতার ৫০ বছর অতিক্রম করেছি। আজও আমাদের স্বপ্ন পূরণ হয়নি। কারণ, স্বাধীনতার পরই আমরা নানা জন নানা মতে ও পথে বিভক্ত হয়ে পড়েছি। দেশমাতৃকার স্বার্থে এক হতে পারিনি। কিন্তু এখনো সময় ফুরিয়ে যায়নি। '৭১ সালের ৭ মার্চে বঙ্গবন্ধুর ভাষণে পুরো জাতি যেমন এক হয়েছিল তেমনই আবারও এক হয়ে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব। আর এ দায়িত্ব পালন করতে হবে নতুন প্রজন্মকে। নতুন প্রজন্মের কাছে আমাদের প্রত্যাশাও অনেক। ১৯৭১ সালে ৭ মার্চের ভাষণ শুনে মুক্তিকামী জনতার সারিতে দাঁড়িয়ে আমিও পাকিস্তানের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে যুদ্ধে গিয়েছিলাম। আমি চাকরি করতাম যশোর জেলার, মোবারকগঞ্জ সুগার মিলে। সেই সময়ে যশোর সেনানিবাস থেকে সুগার মিলের আশপাশে শীতকালীন মহড়ায় আসা আমার পরিচিত এক বাঙালি সেনা গোপনে আমাকে জানিয়ে দিলেন, পারলে দ্রুত বাড়ি চলে যাও, অবস্থা ভালো না। ১ এপ্রিল সকাল ১০টার দিকে যশোর-ঢাকা রোডে পাক বাহিনী গুলি চালিয়ে রাস্তার সাধারণ মানুষ মেরে সামনে ঝিনাইদহ, কুষ্টিয়ার দিকে এগিয়ে যেতে থাকে। পাকসেনার গাড়ি চলে গেলে দেখা যায়, রাস্তার পাশে অনেক সাধারণ মানুষের লাশ পড়ে আছে। এ দৃশ্য দেখে বাঙালিরা আরো জাগ্রত হয়। অস্ত্র নিয়ে যশোর সেনানিবাস থেকে বাঙালি সেনারা বেরিয়ে এসে স্থানীয় যুবকদের নিয়ে পাকসেনাদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলে। তারা রাস্তায় ব্যারিকেট দিয়ে সুকৌশলে অনেক পাকসেনাকে পাকড়াও করে মেরে ফেলে।

মুক্তিযোদ্ধাদের খাবারের জন্য আমি এবং নুর আলী বিশ্বাসসহ সংগ্রাম কমিটির সদস্যদের নিয়ে বাসায় বাসায় ঘুরে রুটি, চিড়া, গুড় সংগ্রহ করি। এভাবে ১৯ এপ্রিল পর্যন্ত কঠিন অসুবিধার মধ্যেও সুগার মিলে ছিলাম। প্রতিদিন বিবিসির খবর শুনে অবস্থা অবগত হতাম আর বাহিরে দেখতাম মিলের পাশ দিয়ে কিভাবে বাঙালিরা স্বজনদের নিয়ে বন্ধু রাষ্ট্রে চলে যাচ্ছে শরণার্থী হয়ে। নিকটতম সব কর্মকর্তা শ্রমিক/কর্মচারী সুগার মিল ছেড়ে বাড়িতে চলে গেছে। আমি একা খুবই চিন্তিত হয়ে পড়ি। আমার বাড়ি রংপুরের শেষ প্রান্ত ভুরুঙ্গামারীতে। নুর আলী বিশ্বাস আমাকে সাহস দিয়ে বলেন, চলুন মেহেরপুরে যাই। ১৭ এপ্রিল সকালে মেহেরপুরে পৌঁছি। সেখানে গিয়ে দেখি মেহেরপুরের আমবাগানে (বৈদ্যনাথ তলা) মুজিব নগর সরকার গঠনের প্রস্তুতি চলছে। কিছুক্ষণের মধ্যে শপথ গ্রহণ শুরু হবে। কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ উপদেশমূলক ভাষণ এবং নির্দেশাবলি শুনি। শপথ অনুষ্ঠান শেষে সুগারমিলে ফেরত চলে আসি। ১৯ এপ্রিল আমি শরণার্থীদের সাথে হেঁটে বাগদা সীমান্ত পার হয়ে বনগাঁ গিয়ে মাগুরার ছোহরাব হোসেন এবং যশোরের রওশন আলীর নিকট থেকে পরিচয়পত্র নিয়ে বনগাঁ থেকে ট্রেনে কলকাতায় যাই। যাওয়ার পথে ট্রেনে এক মহিলা যাত্রী আমাকে দেখে রাগ করে বলেন, আপনারা যুবক ছেলেরা জয় বাংলা ছেড়ে চলে আসছেন কেন? মুক্তিযুদ্ধে যান। আমরা সম্ভ্রম হারিয়ে এসেছি। উনার কথায় আমি কোনো উত্তর দিতে পারিনি। এরপর কলকাতায় গিয়ে হাওড়া স্টেশন থেকে জলপাইগুড়িগামী ট্রেনে উঠে কুচবিহারের উদ্দেশে রওনা হলাম। এরপর কুচবিহার পৌঁছে সেখান থেকে বাসে করে দিনহাটা হয়ে সাহেবগঞ্জ নেমে হেঁটে বিকাল ৫টায় মুক্ত এলাকা ভুরুঙ্গামারী পৌঁছি। জামতলায় জব্বার মিয়ার চায়ের দোকানের সামনে শামসুল হক চৌধুরী এমপি, পেটলা মজিবর রহমান, ফজলার রহমান, আব্দুল জলিল সরকার, জয়নাল মিয়া, ডা. নিয়ামত আলী, আব্দুল মান্নান, কাদের ব্যাপারী, ফনী ভুষণ সাহা, আক্তার মন্ডল, ইসহাক ব্যাপারী, তমিজ মাস্টার, মধু মাস্টার, হাকিম শিকদারসহ আরো অনেককে মিটিং করতে দেখতে পাই। শামসুল হক চৌধুরী আমাকে দেখে চিৎকার করে কাছে ডেকে বললেন, তুই কেমন করে আসলি? ঐদিকের খবর বল। আমি বিস্তারিত ঘটনা খুলে বললাম। তিনি আমাকে ক্যাপ্টেন নওয়াজেশের সাথে কাজ করার নির্দেশ দিলেন। পরের দিন ক্যাপ্টেন নওয়াজেশের সাথে দেখা করি। তার নির্দেশক্রমে প্রথম দিকে মুক্তিযোদ্ধাদের যাতায়াত ও খাবার ব্যবস্থার জন্য ফায়ার সার্ভিসের একটি পিকআপ ভ্যান নিয়ে আসামের গোলকগঞ্জ থেকে পেট্রোল এবং জয়মনিরহাট, নাগেশ্বরীর খাদ্যগুদাম থেকে চাল সংগ্রহ করে এনে সিও অফিসে ক্যাপ্টেনের কাছে রাখতে শুরু করি। এ ছাড়া উত্তর ধরলামুক্ত থাকার সময়ে নাগেশ্বরীর আওয়ামী লীগের সংগঠক শেখ মজিবের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ডা. ওয়াশেক আহম্মেদ ও ভুরুঙ্গামারীর মজিবুর রহমানের সাথে মুক্তিযুদ্ধের বিষয়ে বিভিন্ন সলাপরামর্শ করি। কুড়িগ্রাম পাকবাহিনীর দখলে



চলে গেলে উত্তর ধরলামুক্ত রাখার জন্য আমাদের জোয়ানরা বিভিন্ন জায়গায় প্রতিরোধ গড়ে তোলে। কিন্তু বেশি দিন মুক্ত রাখা সম্ভব হয়নি। এরপর উর্ধ্বতন সংগঠকদের নির্দেশে আমরা ভারতের বর্ডারে চলে যাই। কুচবিহার ৬নং সেক্টরের জোনাল অ্যাডমিনিস্ট্রেটর মতিউর রহমানের কাছ থেকে দিকনির্দেশনা নেই। সাহেবগঞ্জে ক্যাপ্টেন নওয়াজেশের ৬নং সেক্টরের 'সাব সেক্টর' অফিস চালু করি। এরপর নাজিরহাটে ঝন্টু মিয়ার জমিতে 'যুব শিবির' তৈরি করি। নাজিরহাট যুব শিবিরে প্রতিদিন ৪০/৫০ জন যুবক ভর্তি হতে থাকেন। এদের খাওয়া, যাতায়াতসহ সব কিছু আমাকে দেখতে হয়েছে। ২/৩ দিন শিবিরে রেখে প্রাথমিক প্রশিক্ষণ দিয়ে দিনহাটা শিবিরে পাঠানো হত। সেখান থেকে ভারতের সহায়তায় সামরিক ট্রেনিংয়ের জন্য বিভিন্ন জায়গায় নিয়ে যেত। দীর্ঘ ৯ মাস যুদ্ধের কতো করুণ স্মৃতি/ইতিহাস মনের ভেতরে আছে তা ভাষায় বোঝানো কঠিন। ক্লান্তি বলে শরীর থেমে থাকেনি। যখন যেখানে ডাক পড়েছে ছুটে গেছি। ভুরঙ্গামারী পাকবাহিনী দখলে থাকা অবস্থায় গেরিলা কায়দায় কয়েক রাত ভুরঙ্গামারী এসেছি। কিন্তু নিজের বাড়ি খুঁজে পাইনি। রাজাকাররা আমাদের বাড়ি ঘর সব পুড়িয়ে এবং গাছপালা কেটে মাটিতে মিশিয়ে দিয়েছিল। ১৯৭১ সালে ১৪ নভেম্বর ভুরঙ্গামারী হানাদার মুক্ত হলে পরিবারের লোকজন নিয়ে ভারত থেকে নিজ ভূমিতে ফিরে আসি। খোলা আকাশের নিচে অনেক দিন তাবু খাটিয়ে থাকতে হয়েছে। ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশ স্বাধীন হলে দীর্ঘ ৯ মাসের দুঃখ বেদনা ভুলে আমরা আনন্দে মেতে উঠি। এরপর সবার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ২৭ ডিসেম্বর মোবরকগঞ্জ সুগার মিলে পৌঁছে আবার কর্মে যোগ দেই। যারা ঐ সময়ে সুগার মিলে ছিলেন তারা আমাকে দেখে চিৎকার দিয়ে বলে উঠেন "আপনাকে নাকি বর্ডার পার হওয়ার সময় খান সেনারা মেরে ফেলেছে"। আপনার মৃত্যুর সংবাদে আমরা শোক সভা, গায়েবি জানাজা এবং মসজিদে দোয়া মাহফিল করেছি এই আপনার ভাগ্য। এতো সংগ্রাম এবং কষ্টের বিজয়কে ফলপ্রসূ করার জন্য এই নতুন প্রজন্মের কাছে আমার বিনীত আরজ আমরা বাঙালি বীরের জাতি। আল্লাহ ছাড়া কারো কাছে মাথা নিচু করবে না। শেখ মুজিবুর রহমানের ৭ মার্চের ভাষণের 'জয় বাংলা' স্লোগানে বীর বাঙালি দলমত নির্বিশেষে এক জোট হয়ে মাত্র ৯ মাসেই একটি দেশ স্বাধীন করেছি। বিশ্বের ইতিহাসে এমন সাহসিক বিজয়ের নজির নেই। সব ভেদাভেদ ভুলে সবাই এক জোট হয়ে বাংলাদেশকে বিশ্ব দরবারে সুখী সমৃদ্ধ দেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করো।

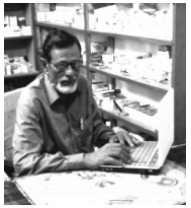

## বীর মুক্তিযোদ্ধা মোড়ল বজলুল করিম

**আড়পাড়া, বারুইপাড়া, বাগেরহাট**

১৯৭১ সালে ৭ই মার্চ রেসকোর্স ময়দানে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক ভাষণ শোনার পর মনে মনে নিয়েছিলাম যুদ্ধের প্রস্তুতি। তারপর আরো বিশ্বাস হয়ে গেল ২৫শে মার্চ কাল রাত্র। ২৫ মার্চ কাল রাত্রে অসহায় বাঙ্গালীর উপর বিরতীহীন পাক সেনাদের গুলিবর্ষণ, তান্ডবলীলা, জ্বালাও পোড়াও লুটপাট হত্যা, তাই আমরা আর ঘরে থাকতে পারলাম না। আমাদের পরিকল্পনা অনুযায়ী সংগঠিত হতে লাগলাম। এক পর্যায়ে আমরা অস্ত্র সংগ্রহের উদ্দেশ্যে মরহুম সুলায়মান মোড়ল, শেখ রুহুল আমিন, বারাশীয়া (ফকিরহাট) গ্রামের ইষ্ট বেঙ্গল রেজিঃ নায়েক আঃ কাদের, আমি নিজে ও আমার ছোট ভাই নূরুজ্জামান (তখন তার বয়স ছিল ১৫/১৬ বছর, সে ছিল আমাদের দলের সবচেয়ে ছোট), ফকির আজমল, মোঃ আজিজুল হক, আহম্মদ শেখ, নূর ইসলাম শেখ, আফজাল মোড়ল এবং পারকুরশাইল গ্রামের শেখ ইশারত আলী, শেখ নজরুল ইসলাম, শহীদ শেখ হোসেন আলী, শহীদ মোড়ল, অহীদ শেখ, ইশারত শেখ মোট ১৬ জন আমাদের গ্রাম হতে কেউ কেউ দুপুরের খাবার খেয়ে না খেয়েই যুদ্ধের উদ্দেশ্যে গ্রামের উত্তর দিকে বিলের ভিতর দিয়ে মরহুম আঃ আজিজ মোড়লের খোলা বাচাড়ী নৌকায় করে হানাদার মুক্ত এলাকা দিগংগা বারুইগাতী হয়ে সারুলিয়া রাজপাট আমাদের এক আত্মীয় মোঃ হাসেম মিয়া বাড়ীতে রাত্র যাপন করি। ভোর রাতে পায় হেটে চুনখোলা গিয়ে নৌকা যোগে যশোর জেলার আড়পাড়া বরইচারা হয়ে কালিবাবু রোড (সিএন্ডবি) পার হয়ে দিনের বেলায় একটা আখ খেতে দিন যাপন করি। রাতে বাগদা বডারের কাছেই রাত্র যাপন করি। মাদারতলা নামক একটা বাজার পাই কিন্তু কোন বসতি দোকান ছিল না। পরের দিন সকালে বাগদা বডার পার হয়ে বাস যোগে বশিরহাট ক্যাম্প এ নাম লিখিয়ে ভ্যাবলা ক্যাম্পে অবস্থান করি। স্বসস্ত্র ট্রেনিংয়ের উদ্দেশ্যে আমাদের মধ্য হতে ৩ জন ১) মরহুম সুলাইমান মোড়ল, ২) আফজাল মোড়ল ৩) শহীদ মোড়ল বিহার বীরভূম ট্রেনিং সেন্টারে যায়। পরে ওরা অন্য দলের সাথে ট্রেনিং শেষ করে বাগেরহাটের কান্দাপাড়ার আমজাদ মিঞার সাথে আসে। আমরা বাকি সবাই টেট্রা ক্যাম্পে অবস্থান করি। ৭/৮ দিন থাকার পর বিহার চাকুলিয়া স্বসস্ত্র ট্রেনিং এর উদ্দেশ্যে রওনা হই। একই সঙ্গে আমাদের ইউনিয়নের বাকপুরা গ্রামের শেখ



লেয়াকত আলী, শেখ বেয়াজ উদ্দিন ছিল। এবং মোঃ আতিয়ার জোমাদ্দার, মোশারাফ জোমাদ্দার, নওয়াব আলী খা সহ আরো অন্যান্য ইউনিয়নের বীর মুক্তি সেনারা আমাদের সাথে ছিল। পূর্বেই আমাদের গ্রামের আহম্মদ শেখ এবং নূর ইসলাম শেখ কিছু জিনিসপত্র কেনার উদ্দেশ্যে ক্যাম্পের বাইরে আসে এবং পরবর্তীতে আর ক্যাম্পে ফিরে যায় নি। পরে বাকী সবাই স্বসস্ত্র ট্রেনিং নেয়ার জন্য ট্রেন যোগে চাকুলিয়ায় পৌছাই। এক মাস ট্রেনিং এর মধ্যে প্রতিটা ইভেন্টে আমি প্রতিযোগীতায় অত্যন্ত দক্ষতার সাথে পাশ করি ও প্রথম স্থান অধিকার করি। রাইফেল সুটিং এ ১১টা উইংস ছিল এবং সেই উইংস গুলিতে সব প্রতিযোগী ট্রেনারদের মধ্যে আমি প্রথম স্থান লাভ করি। ২য় হয় বাকপুরা গ্রামের শেখ লেয়াকত আলী। ট্রেনিং শেষ করে বেগুনদিয়া ক্যাম্পে আসি। ওখানে মেজর এম এ জলিল (৯নং সেক্টর কমান্ডার) এর কাছে রিপোর্ট করার পর দুই-তিন দিন সেখানে থাকি। পরে ক্যাপ্টেন তাইজুল ইসলাম সাহেবের নেতৃত্বে ৯নং সেক্টরের অধীনে সর্ব বৃহৎ অস্ত্রসস্ত্রে সজ্জিত হয়ে শতাধিক মুক্তিসেনা বাগেরহাট শহরের উত্তর অঞ্চলে প্রধান ঘাটি করার উদ্দেশ্যে বড় ২টি বাস যোগে বাগদা বডার পার হওয়ার উদ্দেশ্যে রওনা হই। পথের মধ্যে আমাদের একটি বাস দূর্ঘটনায় সেটির মধ্যে আমি নিজে ও আমার ছোট ভাই সহ আরো অনেকেই ছিলাম। সেখানে আমরা অনেকেই আহত হই। বাসটি বিকল হয়ে গেলে পাশে থাকা ইন্ডিয়ান আর্মিদের ঘাটিতে সংবাদ পৌছানোর সঙ্গে সঙ্গেই তাদের গাড়ী নিয়ে এসে আহতদের প্রাথমিক চিকিৎসা শেষে আমাদের অন্য গাড়ীটি সহ বাগদা বডার পার করে দেয়। আমাদের দলের ভিতর থেকে ৩জন খুব গুরুতর আহত হওয়ার কারণে ঐ আর্মি ক্যাম্প হাসপাতালে চিকিৎসা অবস্থায় থেকে যায় এবং তাদের অস্ত্র আমরা নিয়ে আসি। আমরা বডার পার হয়ে নিরাপদ এলাকা দিয়ে খুব সতর্কতার সাথে সোর্সের মাধ্যমে দিনে সুন্দরবন এবং রাতে খুলনা জেলার তেরখাদা থানার এলাকা হয়ে শন্তষপুর হাইস্কুলে এসে ঘাটি করি যা বাগেরহাট থানার অর্ন্তগত এবং সেখানে থেকে বিভিন্ন এলাকার পাক বাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধ করি। প্রতিটা যুদ্ধে আমি অংশগ্রহণ করি। নাজিরপুর থানার রঘুনাথপুর ক্যাম্পে আক্রমণ করা কালীন সময়ে আমাদের সঙ্গী শেখ হোসেন আলী সহ ২ জন শহীদ হন। গোটাপাড়া, পানিঘাট, চিরুলিয়া বিষ্ণুপুর, বাবুরহাট, বয়াসিংগা নামক এলাকায় পাক বাহিনীদের সাথে বিভিন্ন সময়ে সম্মুখ যুদ্ধ হয়। তাছাড়া চিত্রা নদীর এপার ওপার পাকবাহিনী এবং রাজাকারদের সাথে প্রতিনিয়ত যুদ্ধ লেগেই ছিল। এর ভিতর আমার স্মরণীয় গোটাপাড়া ও বাবুরহাট যুদ্ধে হানাদার বাহিনীদের পরাস্ত করে ওদের অনেকের লাশ নদী হতে উদ্ধার করি ও সাথে যুদ্ধকালীন

সময়ের অনেক অস্ত্র ও গোলাবারুদ উদ্ধার করি। আমরা যুদ্ধকালীন সময়ে নিজ এলাকায় না থাকার কারণে ঐ সময়ে রাজাকার ও হানাদার বাহিনীরা আমাদের পরিবারের অনেক ক্ষতিসাধন করেছে। রাজাকার বাহিনীর কমান্ডার রজব আলীর লালনকৃত রাজাকাররা আমাদের বাড়ী ঘর লুট-পাট ও জ্বালাও পোড়াও করেছে। এভাবে পাক হানাদার বাহিনীর সাথে ৭/৮ মাসব্যাপী যুদ্ধ হওয়ার পর এক পর্যায়ে বাগেরহাটের বিভিন্ন এলাকার যুদ্ধে হানাদার বাহিনীরা পর্যাক্রমে পরাজিত হতে থাকে এবং ১৬ই ডিসেম্বর পাক বাহিনী ঢাকায় আত্মসমর্পণ করলে আমরা বাগেরহাট শহর মুক্তকরণ অভিযান অব্যহত রাখি এবং রাজাকার বাহিনীর প্রধান ফকির রজ্জব আলী তার দলবলসহ পালিয়ে যায় এবং ১৭ই ডিসেম্বর আমরা বাগেরহাট শহর দখল করি এবং বিজয় পতাকা উত্তোলন করি। আমরা বাগেরহাটে ক্যাপ্টেন তাইজুল ইসলাম এর নিকট আমাদের সকল অস্ত্র জমা দিয়ে ম্যালেশিয়া ক্যাম্পে থাকি (নূরুল আমিন হাইস্কুলে) উল্লেখ্য ম্যালেশিয়া ক্যাম্পে থাকাকালীন আমি বি,এইস,এম পদে নিযুক্ত হয়ে দায়িত্ব পালন করি। পরে ক্যাম্প বিলুপ্ত হবার পর লেখাপড়ার উদ্দেশ্যে আমি বাড়ীতে চলে আসি।

## বীর মুক্তিযোদ্ধা বেগম সালেহা

**মেহেরপুর**

মুক্তিযুদ্ধে আমার ভুমিকা এক জন মুক্তিযোদ্ধা হিসাবে। আমার অবদানের কথা যদি বলতে হয় তাহলে বলবো আমি স্বাধীনতা সংগ্রাম সমর্থন করে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ডাকে সাড়া দিয়ে চাকুরী ছেড়ে ১৭ই এপ্রিল দেশ ত্যাগ করি এবং ভারতের পশ্চিমবঙ্গ বেতাই যুব ক্যাম্পে অবস্থান করি। বেতাই ক্যাম্পে আহত মুক্তিযোদ্ধাদের সেবায় ও শিক্ষকতা কাজে নিজেকে নিয়োজিত করি।



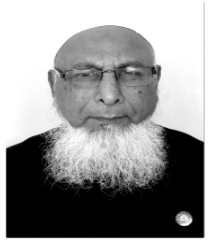

## বীর মুক্তিযোদ্ধা মো. আকরাম আলী

**পূর্ব আলিপুর, ফরিদপুর**

সবেমাত্র ফরিদপুর ইয়াছিন কলেজে ভর্তি হয়েছি। ১৯৬৯ সালে অসহযোগ আন্দোলনের ফলে আইয়ুব খানের পতন হয়েছে। ইয়াহিয়া সরকার ১৯৭০ সালে সাধারণ নির্বাচনের ঘোষণা দেন। নির্বাচনে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ অংশ নেয়। বঙ্গবন্ধু নির্বাচনে প্রচারণার জন্য বরিশাল থেকে পথসভা করতে করতে ফরিদপুর হয়ে ঢাকা রওনা দেন। বঙ্গবন্ধুকে প্রথম দেখবো বলে ফরিদপুর পুরাতন বাসস্ট্যান্ডে আমার আব্বা আঃ জব্বার মোল্যা ও আমি উপস্থিত ছিলাম। বঙ্গবন্ধুকে দেখে আমার অনুপ্রেরণা আরও বেড়ে গিয়েছিল। বঙ্গবন্ধুর ভাষণ শুনে মনে হয়েছিল বঙ্গবন্ধুর কণ্ঠে জাদু আছে। আমি ছাত্রলীগের সদস্য হিসেবে নগরকান্দা থানার কিছু অংশ ও বোয়ালমারী থানার কিছু অংশ নিয়ে নির্বাচনী প্রচারণা শুরু করি। গ্রামের স্কুলের কিছু ছেলে নিয়ে ৮/১০ জনের একটি দল তৈরি করে এ অঞ্চলের প্রতিটি হাটে টিনের চোং দিয়ে ৬-দফা ও ১১-দফার আলোকে প্রচার করি ও পশ্চিম পাকিস্তান ও পূর্ব পাকিস্তানের মধ্যে বৈষম্য তুলে ধরি। নৌকা মার্কায় ভোট দেয়ার জন্য অনুরোধ করি ও জয়বাংলা স্লোগানসহ অন্যান্য স্লোগান দেই। প্রথমদিকে তেমন কোন সাড়া না দিলেও পরবর্তীতে আমাদের সাথে অন্যান্যরাও সাড়া দেয়। এতে বুঝতে পারলাম মানুষ বঙ্গবন্ধুর কথা শুনতে ও দেখতে চায় (তখন দেখার কোন মাধ্যম ছিল না)। সন্ধ্যায় গ্রামে এই ছেলেগুলোকে নিয়ে নৌকা মার্কায় ভোট চাই। গ্রামের সাধারণ মানুষ আমাদের সাথে যোগ দেয়। কিন্তু মৌলভীর দল বাড়িতে এসে বাবা ও বড় ভাই এর কাছে নালিশ দেয়, বলে এদেশকে কী আপনারা হিন্দুস্থান করতে চান। আমার বাবা বঙ্গবন্ধুর একনিষ্ঠ ভক্ত, তাই কোন কর্ণপাত করেন না। বড়ভাই রাজেন্দ্র কলেজে জাফর ভাই এর সাথে ছাত্রলীগ করেন। প্রতিদিন আমার পরিবার আমাকে আর্থিকভাবে এ কাজে সাহায্য করতো ও উৎসাহ দিতো। মৌলভী সাহেবরা বলাবলি করতো এরা নাস্তিক, পাকিস্তানের বিপক্ষে কাজ করে। নির্বাচনে পূর্ব পাকিস্তানের প্রাদেশিক পরিষদের ৩০০টি আসনের মধ্যে আওয়ামী লীগ ২৮৮টি আসন লাভ করে ও জাতীয় পরিষদের ১৬৯টি আসনের মধ্যে ১৬৭টি আসন লাভ

করে। ইয়াহিয়া খান ১০ জানুয়ারী ঘোষণা করেন ৩ মার্চ ঢাকায় প্রথম অধিবেশন বসবে। কিন্তু ১ মার্চ এক ঘোষণায় অধিবেশন স্থগিত ঘোষণা করা হয়। আমাদের ফরিদপুরের তৎকালীন আওয়ামী লীগ নেতা এ্যাডভোকেট শামসুদ্দিন মোল্যা, কে.এম ওবায়দুর রহমান, ইমামউদ্দিন আহমেদ, এডভোকেট মোশারফ হোসেন, এডভোকেট হায়দার হোসেন, এডভোকেট আঃ ছালাম, গৌর চন্দ্র বালা, অধ্যক্ষ দেলোয়ার হোসেন, নূরনবী ভাই এবং ছাত্রনেতা শাহ মোঃ আবু জাফর, সৈয়দ কবিরুল আলম, সালাউদ্দিন আহম্মেদ অন্যান্য নেতৃবৃন্দের পরামর্শে ২ ও ৩ মার্চ হরতাল পালনসহ ৭ই মার্চ রেসকোর্স ময়দানে মহাসমাবেশের বঙ্গবন্ধুর ভাষণের অপেক্ষায় থাকি। পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী ৭ই মার্চ বঙ্গবন্ধু রেসকোর্স ময়দানে ঐতিহাসিক এক জ্বালাময়ী ভাষণ দেন। তিনি উদাত্ত কণ্ঠে আহবান জানান, "এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম। রক্ত যখন দিয়েছি, রক্ত আরও দেব, দেশকে মুক্ত করে ছাড়বো ইনশাল্লাহ।" তিনি আরও বলেন, "ঘরে ঘরে দূর্গ গড়ে তোল। আমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়েই শত্রুর মোকাবিলা করতে হবে।" বঙ্গবন্ধুর ভাষণে সকলে অনুপ্রাণিত হয়ে অসহযোগ আন্দোলনে প্রতিদিনই মিটিং মিছিল সহ বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয়। ২৫শে মার্চ গভীর রাতে খবর পেলাম পাকবাহিনী রাজারবাগ, পিলখানা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন স্থানে বর্বরোচিত হামলা করে ব্যাপক হত্যাযজ্ঞ চালিয়েছে। বঙ্গবন্ধুকে গ্রেফতার করা হয়েছে। গ্রেফতারের পূর্বেই বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়েছেন। যা বঙ্গবন্ধুর পক্ষে চট্টগ্রামের কালুর ঘাট বেতার কেন্দ্র থেকে আওয়ামী লীগ নেতা আঃ হান্নান ঘোষণা দেন। এরই ধারাবাহিকতায় স্থানীয় আওয়ামী লীগ ও ছাত্র নেতাদের নির্দেশে ফরিদপুর স্টেডিয়াম ও রাজেন্দ্র কলেজে ট্রেনিং ক্যাম্প করা হয়। ফরিদপুর স্টেডিয়ামে আবু সাঈদ ইউসুফ, ছত্তার মন্ডলসহ আরও কয়েকজন ট্রেনিং দেয়। অপরদিকে রাজেন্দ্র কলেজের মাঠে ইউ.ও.টি.সি রাইফেল দিয়ে মোঃ মোকাররম হোসেন, মোঃ আবুল ফয়েজ সহ কয়েকজন ট্রেনিং দিতে থাকেন। আমি স্টেডিয়ামে ট্রেনিং গ্রহণ করি। অনেকেই ট্রেনিংপ্রাপ্ত হয়ে গোয়ালন্দ ঘাট, সিএন্ডবি ঘাট প্রতিরোধ ব্যবস্থায় অংশ নেন। আমরা গ্রাম থেকে অবসরপ্রাপ্ত আর্মি, পুলিশ, চৌকিদারদেরকে এনে দেই। তাদেরকেও প্রতিরক্ষার কাজে লাগানো হয়। ২১শে এপ্রিল ১৯৭১ পাক আর্মি ফরিদপুর আক্রমণ করে, গোয়ালন্দ হয়ে ফরিদপুর এসে সার্কিট হাউসে অবস্থান নেয়। আমি গ্রামের বাড়ি নগরকান্দার বিভাগদী (বর্তমান সালথা থানা) চলে যাই। খাড়দিয়ার আবুল কালাম আজাদ (বাচ্চু রাজাকার) ১০-১২ জন সহযোগী নিয়ে আমাদের পাশে হিন্দু অধ্যুষিত নতুবদিয়া গ্রামে ব্যাপক লুটপাট ও অগ্নিসংযোগ



করে। পারিবারিক ভাবে সিদ্ধান্ত নেয়া হলো ভারতে যাওয়ার জন্য। একই পাড়ার আবু সাইদ খান রাজেন্দ্র কলেজের ছাত্র। তার সাথে পরামর্শ করি। বোয়ালমারীর জাফর ভাই এর সাথে আমরা ভারতে যাব। তার পরের দিন বোয়ালমারী গিয়ে আমরা জানতে পারি জাফর ভাই ভারত চলে গেছেন। বিকেল হয়ে যাওয়ায় সাঈদ ভাই বাইখির গ্রামে তার আত্মীয়ের বাড়িতে গেলেন, আমি বাড়ি চলে এলাম। পরের দিন বাইখির গিয়ে শুনতে পাই সাঈদ ভাই বাড়ির লোকদের না বলে চলে গেছেন। মনটা খারাপ হয়ে গেল। আমি বাড়ি এসে গ্রামের ৬/৭ জন ছেলে নিয়ে বাড়ির ভিতরেই লাঠিসোঠা দিয়ে নিজেরাই ট্রেনিং দিতে শুরু করি। সিদ্ধান্ত হলো প্রথমে আমি, ওহাব ও জাফর ভারত যাব। পরবর্তীতে আমার বড় ভাই আবু বকর রাজেন্দ্র কলেজের ডিগ্রী ছাত্র (সবাই তাকে বাকা ভাই বলে সম্বোধন করতো) কয়েকজনকে নিয়ে ভারত যাবে। নৌকাই ছিল তখন একমাত্র যানবাহন। পরের দিন আমার বাড়ির পাশ দিয়ে বয়ে চলা মাঠিআদা নদীর পাড়ে অপেক্ষায় ছিলাম। তখন জানতে পারি নৌকায় ভাংগার দুইটি হিন্দু পরিবার ভারতে যাচ্ছে, আমরা তাঁদের নৌকায় উঠে পরলাম। আরও ৬/৭টি নৌকা আমাদের নৌবহরে যুক্ত হলো। বোয়ালমারী থানার সাতৈর ইউনিয়নের ঘোড়াখালী রেলওয়ে ব্রীজ। ৬/৭ জন রাজাকার যারা এই ব্রীজটি পাহারা দিচ্ছিল তারা আমাদের নৌকাগুলিকে আটকায় এবং আমাদের নৌকা থেকে নামিয়ে গাছের সাথে বেঁধে ফেলে। আমরা ভয় পেয়ে যাই, কারণ যেকোন সময় ট্রেনে পাক আর্মি চলে আসলে আমাদের মেরে ফেলবে। ভাংগার ভারতগামী পরিবারগুলোকে বললাম, কিছু টাকা-পয়সা দিয়ে তাদের কাছ থেকে মুক্ত হওয়ার ব্যবস্থা করার জন্য। প্রায় এক ঘন্টা পার হয়ে গেল। একজন রাজাকার আমার সামনে এসে বলে, তোমার বাড়িতো বিভাগদী। আমার লোকটিকে দেখে চেনা চেনা মনে হলো। কারণ আমি কাদেরদি স্কুলে ষষ্ঠ শ্রেণিতে পড়াকালীন সময়ে যে বাড়িতে লজিং থাকতাম, লোকটি ঐ বাড়ির রাখাল ছিল। তাকে বললাম যেভাবে হোক আমাদের বাঁচান। তুমি কোথায় যাবে? আমি বললাম, মধুমতি নদীর ঐ পাড়ে আমার মামা বাড়িতে যাব। তোমাদের নৌকা কোনটি? আমি দেখিয়ে দিলে আমাদের নৌকাটি ছেড়ে দিল। আমার সহযাত্রী পরিবারটি আমার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলো। আমাদের নৌকাটি যশোর আড়পাড়া যেতে যেতে সন্ধ্যা হয়ে গেল। আড়পাড়ায় অপেক্ষারত অনেক শরণার্থীদের সাথে আমরাও আড়পাড়া স্কুলে থেকে গেলাম। রাতেই স্কুলে কয়েকজন লোক এসে প্রস্তাব দিলো, কিছু টাকা-পয়সা দিলে আমাদের রাস্তা পার করে দিবে। আমরা ভোর রাতেই রওনা হলাম। রোড পার হয়ে ঐ'পাড় যেতেই দুই দিক থেকে ফায়ার শুরু হলো। যার কাছে যা ছিল ফেলে দিয়ে আমরা

দৌড়ানো শুরু করলাম। কিন্তু পথ এতো কর্দমাক্ত ছিল যে দৌড়ানো যাচ্ছিল না। হঠাৎ একটি গাছের শিকড়ে বেঁধে আমি পড়ে গেলাম। উঠে আবার দৌড় শুরু করতেই টের পেলাম আমার পায়ে কিছু হয়েছে, দেখি! পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুলীর নখটা উঠে গেছে। ব্যাথায় হাঁটতে কষ্ট হলেও গন্তব্যে পৌঁছাতে হবে। বড় একটি বিল এর পাড় দিয়ে ভারতের বাঘদা বর্ডারে পৌছলাম। বর্ডার পার হয়ে ঐ'পাড়ে যেয়ে মাঠের মধ্যে শুয়ে পড়লাম আর দাড়াতে পারছি না। আধাঘন্টা পরে লাইনে দাড়িয়ে চিড়া ও গুড় নিলাম। চিড়া-গুড় খেয়ে সবাই বনগ্রামের দিকে রওনা হলাম। বনগ্রাম ফরিদপুর ক্যাম্প নামে পরিচিত স্থানে পৌছাতে রাত ১১ টা বেজে গেল। একতলা বিল্ডিং কেউ নাই। আমাদের তিনজনের মধ্যে ওহাবের বয়স বেশি ছিল। সে পূর্বেও নতিবদিয়া গ্রামের হিন্দু পরিবারের সাথে ভারতে আসা-যাওয়া করেছে। ক্যাম্পের আশেপাশে পরিচিত কাউকে পেলাম না। আধা মাইল দুরে ইতি পূর্বে ভারতে যাওয়া নতিবদিয়া গ্রামের এক হিন্দু পরিবারে বাড়িতে আমরা আশ্রয় নিলাম। তাঁরা ওহাবের পরিচিত, আমার বাবাকে চিনতেন। দরিদ্র পরিবারটি রাতে আমাদেরকে বারান্দায় থাকতে দিল এবং ভাত-ডাল খেতে দিল। প্রায় একদিন না খেয়ে থাকার কারণে, সেই খাবারই আমাদের কাছে অমৃত মনে হচ্ছিল। আমার পা ফুলে যাওয়ায় পরদিন হাঁটতে পারলাম না। ঐখানেই থেকে গেলাম। আমরা যে বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছিলাম তার এক ভাই থাকে রানাঘাট, পেশায় চিকিৎসক। তার কাছে উনার ছেলেসহ আমাদেরকে পাঠিয়ে দিলেন। যথারীতি ট্রেনে রানাঘাট পৌছলাম। স্টেশনের পাশেই ডাক্তার বাবুর বাড়ী। আমরা সে বাড়িতে উঠলাম। আর্থিক অবস্থা তেমন ভাল নয়। ঘরের একপাশে চেম্বার করে রোগী দেখেন ও ওষুধ বিক্রী করেন। চারদিন ঐ বাড়িতে থেকে চিকিৎসা নিয়ে পা একটু ভাল হল। রানাঘাট থেকে কল্যাণী আসলাম। কল্যাণী শরণার্থী ক্যাম্পে খাদ্য বিভাগের ইন-চার্জ কানাইপুর এর আলী ভাই। তাঁর সাথে আলাপ করে জানতে পেলাম ট্রেনিং ছাড়া অস্ত্র পাওয়া যাবে না। যথারীতি কল্যাণী যুব ক্যাম্পে ভর্তি হলাম। অনেকেই বললো, তারা বেশ কিছু দিন আছে কিন্তু ট্রেনিং নিতে পারে নাই। তাদের কাছ থেকে জানতে পারি স্থানীয় এম.পির অনুমতিপত্র ছাড়া ট্রেনিং এর লোক নেয়া হয় না। আলী ভাইকে বিষয়টি জানালে তিনি লোক পাঠিয়ে কে.এম ওবায়দুর রহমান ভাইয়ের কাছ থেকে অনুমতিপত্র এনে দিলেন। কিন্তু রিক্রুটিং টিমের লোক আর আসে না। এভাবে প্রায় ১৫দিন কেটে গেল। দুইবেলা পি.টি করি আর কি? একটি রিক্রুটিং এজেন্ট এসে সকলকে লাইনে দাড়াতে বললো। আমাদের তিনজনের মধ্যে আমাকে শিক্ষাগত যোগ্যতায় সিলেক্ট করলো। কিন্তু জাফরকে ও ওহাবকে সিলেক্ট করল না। কিন্তু আমরা তিনজন



একসাথে ট্রেনিং নিতে আগ্রহ প্রকাশ করলাম। এক মাস কেটে গেল। নতিবদিয়ার রবিন নামের ছেলেটি ব্যবসার কাজে সপ্তাহে ২বার বাংলাদেশ ও ভারত আসা-যাওয়া করে। তার কাছ থেকে আমাদের বাড়ীর খবরাখবর পাই। আমার বড় ভাই রবিনের মাধ্যমে খবর দিয়েছে অস্ত্রের ব্যবস্থা হয়ে গেছে। আমরা যদি ট্রেনিংএ না যেতে পারি তাহলে যেন বাড়ি ফিরে আসি। খবরটা পেয়ে আমরা তিনজন আবার বাড়ি ফিরে আসলাম। এক চেয়ারম্যানের মাধ্যমে ২টি রাইফেল যোগাড় করা হয়েছে। এছাড়া তৎকালীন কায়েদে আজম কলেজের (বর্তমান শহীদ সোহরাওয়ার্দী কলেজ) প্রফেসর আবুল কালাম আজাদ একটি পিস্তল ও স্টেনগানসহ আমাদের নিকটতম প্রতিবেশী সাঈদ ভাইয়ের বাড়িতে এসেছে। তিনি সাঈদ ভাইয়ের মামাতো ভগ্নিপতি আমাদের বাড়িতে ট্রেনিং এর ব্যবস্থা করা হয়েছে। কিছুদিন এভাবেই চলছিল। আমি ও বন্ধুবর কাজী সালাউদ্দিন ইয়াছিন কলেজের ছাত্র ছিলাম। আমার বাড়ির এলাকা অনেক নিরাপদ, তাই সালাউদ্দিন লোক পাঠিয়েছে, বিস্তারিত জানতে। সালাউদ্দিনকে ঠিকানা দিয়ে আসার জন্য বলা হল। ইতিমধ্যে শাহ্ মোঃ আবু জাফর ভাই, মধুখালীর কাইয়ুম ভাই, সিংহপ্রতাপের আতিয়ার, বোয়ালমারীর সিদ্দিক ভাই সহ ৬/৭ জন নৌকায় আমাদের বাড়িতে আসে। জাফর ভাই বিস্তারিত আলাপ করার পর নগরকান্দার কিছু অংশের দায়িত্ব বাকা ভাইকে দেন আইন-শৃংখলা ও সামাজিক নিরাপত্তার ব্যবস্থা নেয়ার জন্য। কারণ ইতিমধ্যে কয়েকটি বাড়িতে ডাকাতি হয়েছে। আওয়ামী মনোভাবাপন্ন ও ছাত্রলীগ করে এমন পরিচিতদের ডাকার জন্য লিস্ট করা হলো এবং আমাদেরকে লিস্ট ধরে ডাকার জন্য দায়িত্ব দেয়া হলো। যথারীতি ৪/৫টি নৌকা নিয়ে লিস্ট অনুযায়ী ডাকা হলো। নির্ধারিত রাত্রে আমাদের বাড়িতে যারা উপস্থিত হলেন তারা হলেন, কাকিলাখোলার ওহিদ, রামকান্তপুরের মানিক মিয়া, কোন্দাদিয়ার মোকাদ্দেস, গট্টির মুকুল মিয়া, সালথার ইউনুস মিয়া, নগরকান্দার আজিজ মোল্যা, ভাংগার বড় আবু, সহিদ, তালমার শহিদ, বোয়ালমারীর টোকন, সোনাপুরের বদউজ্জামান , বাঘারকান্দির মালেক, নকুলহাটির বাদশাহ প্রমুখ সহ প্রায় শতাধিক লোক জমা হলো। জাফর ভাই ও প্রফেসর আবুল কালাম আজাদ তাদের সাথে বিস্তারিত আলাপ করলেন ও পরামর্শ দিলেন, আমাদের ট্রেনিং ক্যাম্প বাড়ি থেকে সরিয়ে নতুবদিয়া প্রাইমারী স্কুলে নিলেন এবং সেটা উদ্বোধন করলেন। ফরিদপুরের আবুল হোসেন ভাইকে ট্রেনিং দেয়ার জন্য দিলেন। এরপর মিরাজসহ আরও কয়েকজন ক্যাম্পে আসে। এছাড়া ভারত থেকে ট্রেনিংপ্রাপ্ত হয়ে যে মুক্তিযোদ্ধাগণ এ এলাকায় আসেন, তাদেরকে বাড়িতে থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। ট্রেনিং ক্যাম্পে নিয়ে তাঁদেরকে দিয়ে

ট্রেনিং করানো হয়। অক্টোবর মাসের দিকে খবর এলো, একটি ডিম্যুনেশন টিম আমাদের বাড়িতে আসবে, দুপুরে তাঁরা খাবেন। টিম প্রধান মোহাম্মদ আলী দেওয়ান, বাড়ী শরীয়তপুর। বাখুন্ডা ব্রীজ সম্পর্কে তাদেরকে বিস্তারিত ধারণা দেওয়া হলো। প্রায় ১৫০ পাউন্ড এক্সপ্লোসিভ দিয়ে বিস্ফোরক তৈরী করলেন। আমাদের লোকবল কম থাকায় সিদ্ধান্ত হলো, বিকালবেলা কমান্ডার হামিদ ভাইকে এ কাজে সাহায্য করার জন্য তাদেরকে বিনোকদিয়া পৌছে দেয়া হলো। এভাবেই চলতে থাকে। ইতিমধ্যে কমান্ডার কাজী সালাউদ্দিন, ডেপুটি কমান্ডার মেজবাহ্উদ্দিন নৌফেল, ডাক্তার রুনু ভাই সহ প্রায় ২০-২৫ জন এসে আমাদের বাড়িতে হাজির হন। থাকার সংকুলান না হওয়ায় ৬/৭ জনকে সাঈদ ভাই এর বাড়িতে থাকার ব্যবস্থা করা হলো। পরবর্তীতে তাদেরকে নতিবদিয়া গ্রামের পশ্চিমদিকে সূর্য্য মন্ডলের বাড়িতে দুইটি টিনের ঘরে ক্যাম্প করে দেয়া হলো। আবার আলফাডাঙ্গার কমান্ডার হিমায়েত উদ্দিন তালুকদার তার দলবল নিয়ে আমাদের বাড়িতে আসলেন। তাদেরকে নতিবদিয়া ক্যাম্পে একসাথে থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করা হলো। আমরা নতিবদিয়া স্কুলের ট্রেনিং ক্যাম্প বন্ধ করে কাজী সালাউদ্দিন বাহিনীর সাথে একত্রিত হয়ে কাজ করার অঙ্গীকার করা হলো। এখন অস্ত্র-গোলাবারুদে, লোকবলে গেরিলা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত। দ্রুত অপারেশন শুরু করা প্রয়োজন। সিদ্ধান্ত হলো কানাইপুর ব্রীজ অপারেশনের জন্য। আমি শুক্রবার রেকি করলাম; ৪ নভেম্বর কানাইপুর ব্রীজ আক্রমণ করা হলো। দুই দলে বিভক্ত হয়ে একদল পূর্ব পাশে কানাইপুর গোরস্থানের পাশ থেকে ও অন্যদল পশ্চিম থেকে ব্রীজ আক্রমণ করা হলো। রাজাকাররা বাংকারের মধ্য থেকে গুলি করতে থাকে। অন্যদিকে পাক আর্মি অনেক দুর থেকে ফায়ার করতে করতে আসতে থাকে। অবস্থা বেগতিক দেখে ব্যাক করে আমাদের উভয় দল নতিবদিয়া ঘাঁটিতে চলে যাই। করিমপুর ব্রীজে গ্রেনেড চার্জ: ৭ নভেম্বর রাতে দুই দিকে দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে করিমপুর ব্রীজে আক্রমণ করা হয়। ঢাকা-খুলনা মহাসড়ক বিধায় বেশি সংখ্যক রাজাকার দল দিনরাত পাহারা দিত। কাজী সালাউদ্দিনের নেতৃত্বে নওফেল, আবু বকর, খোকন, আলী, সিরাজ, খলিল, শাহাদৎ, ওহাব, আইয়ুব ও আমি সহ ১২/১৩ জনের দল। অন্য দলের নেতৃত্বে ছিল হেমায়েত উদ্দিন তালুকদার। বাদশাহ পাট্টাদার, শামসুদ্দিন, দেলোয়ার, রমেন, মমিন, চাঁন মিয়া, মিরাজ, জাফর, আবুবকর (বাকা ভাই), ইদ্রিস, সোহরাব, বাশার, ফরিদ সহ প্রায় ১৫ জনের দল করিমপুর ব্রীজ আক্রমণ করে। ব্রীজের উত্তর দিক থেকে খোকন গ্রেনেড চার্জ করলে দুইজন রাজাকার নিহত হয়। আমরা দুইটি রাইফেল হস্তগত করি। আমাদের উদ্দেশ্য ছিল পাক হানাদারদের ভয় দেখানো। আক্রমণ



শেষে আমরা নিরাপদে ঘাঁটিতে ফিরে আসি। কামারখালী ঘাটে আক্রমণ ও ফেরি নিমজ্জন : আমি ও ইদ্রিস কামারখালী ঘাটে রেকি করে এসে বিস্তারিত তথ্য ও ম্যাপ আমাদের বাড়িতে অবস্থানরত নৌ-কমান্ডো মোহাম্মদ আলী ও আবুল কাশেমকে রিপোর্ট করি। এই মুক্তিযোদ্ধা দল কৌশলে অপারেশন সম্পূর্ণ করে আমাদের বাড়িতে নিরাপদে ফিরে আসে। ৯ ডিসেম্বর ফরিদপুরের করিমপুরে যুদ্ধ: কমান্ডার হেমায়েত ভাই এর সাথে নতুন করে ২জন ই.পি.আর ও ২জন পুলিশ বাহিনীর সদস্য এলএমজি, ল্যান্ডমাইন, হ্যান্ড গ্রেনেড, অনেক ভারী অস্ত্র-শস্ত্র সহ যোগ দেন। এতে আমাদের মনোবল আরও দ্বিগুন বেড়ে যায়। কাজী সালাউদ্দিনের জীবিত পাক আর্মি ধরা খুব ইচ্ছা। ইতিমধ্যে খবর আসে, করিমপুর ও ধোপাডাঙ্গা-চাঁদপুর রোডে করিমপুর গাড়িয়াল ব্রীজে ১৫/১৬ জন রাজাকার থাকে। তাদের আর্মস এ্যামুনিশন নিয়ে আত্মমর্পন করবে। আপনারা ধোপাডাঙ্গা-চাঁদপুর বাজারে আসেন। খবরটি শুনে খুব বিশ্বাসযোগ্য মনে হলো না। রাত্রে সকলে একত্রিত হলে আমি বললাম, রেকি করে বিষয়টির সত্যতা জানা হোক। কিন্তু সালাউদ্দিন ও আরও কয়েকজন মানতে নারাজ। সকাল ৮ টায় আনুমানিক ৩০/৪০ জন মুক্তিযোদ্ধা সালাউদ্দিনের নেতৃত্বে ধোপাডাঙ্গা-চাঁদপুর বাজারে ৯টার দিকে পৌছে যাই। কিন্তু এখানে কোন রাজাকার বা সংবাদদাতাকে খুজে পাওয়া গেল না। স্থানীয় লোকজন জানায়, গতকাল এখানে পাক আর্মি এসেছিল; আজও আসতে পারে। তবে আপনারা সামনে বড়ঘাট নামক স্থানে চলে যান, ঐখানে পজিশন নিতে সুবিধা হবে। দলবলসহ বড়ঘাটে গেলে কাজী সালাউদ্দিন ভাইয়ের নির্দেশে আরও সামনে এগিয়ে যাই (বর্তমানে এ.এইচ জুট মিল অবস্থিত)। যথারীতি তিনভাগে বিভক্ত হয়ে রাস্তার পূর্ব পাশে আমিনুর রহমান ফরিদ, আতাহার, শরিফ, আলী, বাদশাহ, শামসুদ্দিন, ইদ্রিস, বাকা ভাই, শাহাদত, বাশার, আশরাফ, দেলোয়ার, বক্কার, আইয়ুব পুলিশ ও পশ্চিম পাশে নওফেল, খোকন, ওহাব, মজিবর, শামসুদ্দিন, মঈনুদ্দিন, হামিদ, খলিল, মোমিন ও সিরাজ এ্যামবুশ করে থাকে। হেমায়েত ভাই, জাফর ও আমি রাস্তার উপর ইট উঠায়ে ল্যান্ডমাইন স্থাপনের কাজ করছি। হিমায়েত ভাই ও জাফর মাইন স্থাপনের কাজ করছে, আমি রাইফেল নিয়ে কাভার করে আছি। হঠাৎ করে পাকিস্তান আর্মির একটি জীপ আসতে দেখা যায়। কাজী সালাউদ্দিনের কাছে এলএমজি ও গুলি বহনকারী রমেন। অন্যদের হাতে ছিল এসএলআর, রাইফেল ও হ্যান্ড গ্রেনেড। দুই পাশ থেকে ব্রাশ ফায়ার সহ আমি সামনে থেকে ফায়ার শুরু করলে জীপটি পিছু হটে পালাতে থাকে। জীপে থাকা কয়েকজন গুলিবিদ্ধ হয় তা বুঝা যায় না। যশোহর ক্যান্টেনমেন্ট ফল করার পর পাকিস্তানের আর্মি কামারখালী ঘাট হতে

ফরিদপুর পর্যন্ত রাস্তার উপর ফাঁকা জায়গায় অবস্থান করছিল। করিমপুর রাস্তার পার্শ্বেও তাদের অবস্থান ছিল। এই গুলির শব্দে পাকিস্তান আর্মিসহ রাজাকাররা তাদের বাংকার থেকে গুলি বর্ষণ করতে থাকে। বৃষ্টির মতো গুলি আসতে থাকে। তারই একটি গুলি হেমায়েত ভাই এর ডান হাতের মধ্যমা আঙ্গুলে লাগে। আমরা দ্রুত রাস্তার খাদে নেমে যাই। মুহূর্ত দেরি করলে আমরা সবাই ব্রাশফায়ারে গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা যেতাম। রক্ত ফিনকি দিয়ে বেরুতে থাকলে গেঞ্জি ছিড়ে আঙ্গুল বাঁধলেও রক্তে কাপড় ভিজে যাচ্ছিল। কিছুসময় অপেক্ষার পর দেখি পশ্চিম দিক থেকে গুলি আসছে। অর্থাৎ তিনদিক থেকে পাকবাহিনী আমাদের ঘিরে ফেলেছে। হেমায়েত ভাইকে দ্রুত চিকিৎসা দিতে হবে। আমরা ব্যাক-ফায়ার করতে করতে হেমায়েত ভাইকে নিয়ে রাস্তার পাশ দিয়ে পিছন দিকে ফিরতে থাকি। তাকে নিয়ে আজলবেড়া গ্রামের একটি বাড়ি থেকে কাপড় এনে আঙ্গুল ব্যান্ডেজ করে সেখানেই থাকতে বলি। আমি আবার ফিরে আসি। এদিকে রাস্তার পূর্ব পাশে যারা ছিল ফাঁকা মাঠ বিধায় তারা শেল্টার না পেয়ে কিছু রাস্তার কালভার্ট দিয়ে পূর্ব পাশ থেকে পশ্চিম পাশে আখক্ষেতের মধ্যে যায়। বাকি কয়েকজন ফিরে আসতে বাধ্য হয় এবং দুরে অবস্থান নেয়। আমাদের বাহিনী মাঝেমধ্যে গুলি ছোড়ে আর পাকিস্তান আর্মি বৃষ্টির মতো ব্রাশ ফায়ার করতে থাকে। বিকাল গড়িয়ে যায়। আমাদের দল অর্থাৎ যারা রাস্তার পশ্চিম পাশে ছিল, স্থানীয় রাজাকাররা (করিমপুর ও কুশাগোপালপুর গ্রামে ১০/১৫ জন রাজাকার) করিমপুর ব্রীজের দক্ষিণ পাশ দিয়ে যে রাস্তাটা দক্ষিণ দিকে গেছে ঐ রাস্তা দিয়ে পাক হানাদার আর্মিদেরকে পথ দেখিয়ে আমাদেরকে তিনদিক থেকে ঘিরে ফেলে। কয়েকজন অর্থাৎ খোকন, খলিল, বাদশাহ, সিরাজ, আইয়ুব, শাহাদাৎ সহ ৫/৬ জন ছোন ক্ষেতের ভিতর দিয়ে রাস্তার পাশ দিয়ে বের হয়ে আসতে সক্ষম হয়। কাজী সালাউদ্দিন গুলিবিদ্ধ অবস্থায় পার্শ্ববর্তী বাকের মন্ডলের বাড়িতে আশ্রয় নিলে সন্ধ্যার দিকে পাকআর্মি ও রাজাকার দল কাজী সালাউদ্দিনসহ ওই বাড়ির ৩ জনকে গুলি করে মেরে বাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেয়। এছাড়া শহীদ মেজবাহ্উদ্দিন নওফেল (ফরিদপুর), শহীদ ওহাব (নিমতলি খানাখানাপুর, রাজবাড়ি), শহীদ মজিবর, শহীদ শামসুদ্দিন, বোয়ালমারীর শহীদ ময়েনউদ্দিন, পাড়াগ্রামের শহীদ হামিদ (খোলাবাড়িয়া, আলফাডাঙ্গা) ৩ জন সালাউদ্দিন কমান্ডের মুক্তিযোদ্ধা ও ৪ জন হেমায়েত কমান্ডের মুক্তিযোদ্ধা মোট ৭ জন শহীদ হয়। আমরা সকলেই কান্নাকাটি করছিলাম। কাজী সালাউদ্দিনের ভাই কাজী ফরিদের কান্না আর থামানো যাচ্ছিল না। সে এক হৃদয়বিদারক দৃশ্য যা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। পরের দিন সকালে বেশ কিছু লোকজন কাঠের তক্তায় করে মমিন (যার বাড়ি খোলাবাড়িয়া,



আলফাডাঙ্গা) তার শরিরে বেয়নেটের খোচায় ক্ষত-বিক্ষত করা হয়েছে, বুট দিয়ে মাড়িয়ে তার বুকের পাজর ভেঙ্গে ফেলেছে। তাঁকে নতিবদিয়া ক্যাম্পে নিয়ে আসে এবং ডাক্তার রুনু ভাই চিকিৎসা দয়োর পর তাকে মুক্ত অঞ্চলে পাঠিয়ে দেয়া হয়। ১০ই ডিসেম্বর আমরা বিভাগদী উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে গ্রামবাসীদের নিয়ে গায়েবানা জানাজা পড়ি। ১১ ডিসেম্বর শাহ্ মোঃ আবু জাফর ভাই লোক পাঠালে আমরা নতিবদিয়া ঘাঁটি ছেড়ে বোয়ালমারী ডাকবাংলোয় অবস্থান করি। এখানে ৮নং সেক্টরের সাব-সেক্টর কমান্ডার ফ্লাইট লেফঃ জামাল চৌধুরী সহ আরও অন্যান্য কমান্ডারদরে সাথে পরিচিত হই। ১৬ই ডিসেম্বর সকালে আমরা মুক্তিযোদ্ধারা দুই দলে ভাগ হয়ে এক দল নতিবদিয়া হয়ে ফরিদপুরের উদ্দেশ্যে রওনা হই। পথে আমরা পাকবাহিনীর আত্মসমর্পণের খবর পাই। বিজয়ের সংবাদ কানে আসছে, আমরা আনন্দে ফেটে পড়ব নাকি বন্ধু-স্বজন হারানোর দুঃখে ভেঙ্গে পড়ব তা বুঝে উঠতে পারি না। সেই মুহূর্তটি কেমন ছিল তা ভাষায় প্রকাশ করা অসম্ভব। গট্টির কাছা কাছি আসলে সন্ধ্যা হয়ে যাওয়ায় মুকুল মিয়ার বাড়িতে রাত্রে অবস্থান করে সকালে ফরিদপুরের উদ্দেশ্যে রওনা হই। ২য় দল মাঝকান্দি হয়ে ফরিদপুর পৌছায়। উল্লেখ্য যে, ফরিদপুর সদরের করিমপুরে যুদ্ধের মত ভয়াবহ এতবড় যুদ্ধ আর দ্বিতীয়টি হয় নাই। পরে জানা যায় উক্ত যুদ্ধে একজন অফিসার সহ বেশকিছু পাক হানাদার নিহত হয়। আমরা ফরিদপুর এসে করিমপুরে যুদ্ধক্ষেত্রে যাই। সেখানে শহীদ কাজী সালাউদ্দিন, মেজবাহউদ্দিন নওফেল সহ ৭জনের দেহাবশেষ নিয়ে আসি এবং আলীপুর গোরস্থানে যথাযোগ্য মর্যাদায় জানাজাসহ দাফন করি। পরবর্তীতে আমাদের অস্ত্র বায়তুল আমান মিলিশিয়া ক্যাম্পে জমা দেই।

## বীর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুর রহমান শেখ

**খলাগাঁও, টঙ্গীবাড়ী, মুন্সীগঞ্জ**

১৯৭০ সাল। আমি মেট্রিক পরীক্ষার্থী ছিলাম। এসময়েই ছাত্র রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়ি। সে সময় অনুষ্ঠিত হয় পাকিস্তানের সাধারণ নির্বাচন। '৭০এর এই নির্বাচনে পশ্চিম পাকিস্তানের পিপলস পার্টির নেতা জুলফিকার আলী ভুট্টোকে বিপুল ভোটে পরাজিত করে বিজয়ী হন পূর্ব বাংলার অবিসংবাদিত নেতা শেখ মুজিবুর রহমান। তাঁর দল আওয়ামী লীগ বিপুল সংখ্যা গরিষ্ঠতা অর্জন করে। এর আগে শেখ মুজিব বাঙালির ন্যায্য অধিকার আদায়ের জন্য ৬ দফা ঘোষণা করেন–১৯৬৬ সালে। ১৯৬৯ আগরতলা ষড়যন্ত্রের নামে তাঁর বিরুদ্ধে মামলা, এবং গ্রেফতার করা হয়। এর প্রতিবাদে সারা বাংলায় আন্দোলনে নেমে পড়ে বাঙালি। শেখ মুজিবের ঘনিষ্ট সহচর ছাত্রনেতা তোফায়েল আহমেদের নেতৃত্বে গণঅভ্যুত্থান হয়। আমরা সেই গণআন্দোলনে যোগ দেই। পাকিস্তানি স্বৈরশাসক জেনারেল ইয়াহিয়া খাঁন বিপুল ভোটে জয়ী সংখ্যা গরিষ্ঠের নেতা হিসেবে প্রধানমন্ত্রী শেখ সাহেবকে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হতে দিলেন না। তখন বাংলাদেশের ছাত্র জনতা রাজপথে নেমে আসলো ন্যায্য অধিকার আদায়ের জন্য। পাকিস্তানি শাসক ছাত্রদের মিছিলের উপর গুলি চালানোর নির্দেশ দিল। অনেক ছাত্রশ্রমিক নিহত হল। বঙ্গবন্ধু বললেন নির্বাচিত প্রতিনিধির কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করা হোক। সামরিক শাসন তুলে নেয়া হোক, উত্তাল বাংলাদেশ। কোন ভাবেই বঙ্গবন্ধুর কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করবেন না। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ঐতিহাসিক রেসকোর্স ময়দানে ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ দিলেন। বললেন, বাংলার মানুষকে আর দাবায়ে রাখতে পারবা না। আমরা যখন মরতে শিখেছি, আরও মরবো এদেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়বো ইন্‌শাল্লাহ। এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম। বাংলার মানুষ ও দামাল ছেলেরা বঙ্গবন্ধুর মনের কথা ও মনের ভাষা সব বুঝতে পারলেন। বঙ্গবন্ধু ৭ই মার্চ এর ভাষণে বাঙালি জাতিকে স্বাধীনতার সব কথা বলে দিয়েছেন। কি করতে হবে, কোথায় যেতে হবে। ভাষণের পর ২৫ শে মার্চ রাতে ইয়াহিয়া খানের নির্দেশে বঙ্গবন্ধুকে গ্রেপ্তার করে পাকিস্তানের কারাগারে নিয়ে বন্দী করা হলো। পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী বাংলাদেশে গণহত্যা শুরু করলো। বাংলাদেশের মানুষ দেশ ছেড়ে পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্র ভারতে গিয়ে আশ্রয় নিতে লাগলো।



বাংলার দামাল ছেলেরা জীবন বাজি রেখে দেশমাতৃকার জন্য স্বাধীনতার জন্য ঝাঁপিয়ে পড়লো। পাকিস্তানের শাসক ইয়াহিয়া খান বাঙালি সকল সেনা, ইপিআর, পুলিশ ও আনসারের কাছ থেকে সকল অস্ত্র কেড়ে নিতে লাগলো এবং তাদেরকে হত্যা করতে লাগলো। বাঙালি সেনা অফিসারদের বুঝতে আর বাকি রইল না। তারাও বঙ্গবন্ধুর ডাকে দেশের জন্য যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। শুরু হয়ে গেল রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ। দেশের সকল ছাত্র যুবক গ্রামে-গঞ্জে যে যেখানে আছে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি নিতে লাগলো। আমরা আমাদের গ্রামে খলাগাও কাইচ মালধা স্কুলের খেলার মাঠে বাঁশের লাঠি দিয়ে রাইফেল বানিয়ে হাবিলদার সিরাজ খান ও আনসার কমান্ডার আব্দুল মজিদ সিকদার সাহেব আমাদেরকে মুক্তিযুদ্ধের জন্য সকল যুবককে একত্র করে যুদ্ধের জন্য ট্রেনিং দিতে শুরু করলেন। প্রতিদিন বিকালে ৪টা থেকে রাত্র ৭ টা পর্যন্ত আমাদেরকে ট্রেনিং করান। কিভাবে রাইফেল চালাতে হবে তার সকল কৌশল আমাদেরকে শিখান। শত্রু পক্ষের আক্রমণ থেকে কিভাবে নিজেকে রক্ষা করতে হবে সে কৌশলও আমাদেরকে শিখান। রাইফেল নিয়ে ক্রলিং করে কিভাবে আগাতে হবে, এক স্থান থেকে অন্য স্থানে কিভাবে যাবে তারও কৌশল আমাদেরকে বাঁশের লাঠির মাধ্যমে শিখান এবং ধারণা দেন। ট্রেনিং শিখার পর আমরা অস্থিরতার মধ্যে সময় কাটাতে লাগলাম। আর দেরি করা সম্ভব নয়। পাকিস্তানি হায়েনারা যে কোন সময় গ্রামে গ্রামে ঢুকতে পারে। এবং যুবক ছেলেদেরকে টারগেট করে ধরে নিয়ে যেতে পারে। নানা চিন্তা করতে লাগলাম। কিভাবে ভারতে যাওয়া যায়, ঐ খান থেকে ট্রেনিং করে এসে হানাদার বাহিনীর সাথে যুদ্ধ করে আমাদের মাতৃভূমি স্বাধীন করা যায়। রাস্তা খুঁজতে লাগলাম। তখন ছিল বর্ষাকাল। এরই মধ্যে আমাদের থানায়ও হানাদার সেনাবাহিনী ঢুকে পড়েছে। আমি ও আমার ছোট মামা মকবুল হোসেন মোল্লা, আমাদের থানার পাশের বাজারে নৌকা দিয়া ধান ভাঙাতে গিয়ে ছিলাম। ধান ভাঙিয়ে যখন আমরা বাড়িতে আসছিলাম। ঠিক সেই মুহূর্তে থানা থেকে পাকিস্তানি হায়নারা উপরের দিকে ব্রাস ফায়ার শুরু করলো। মানুষকে ভয় দেখানোর জন্য উপর থেকে কয়েকটি গুলি আমাদের নৌকার আসে পাশে এসে পড়লো। আমরাতো ভয়ে অস্থির। ভাগ্য ভাল আমাদের উপরে পড়েনি। আল্লাহর রহমতে আমরা ভালভাবে বাড়িতে চলে আসি। মনে মনে জিদ আসলো আর বসে থাকা যায় না একটা উপায় বার করতেই হবে। কিভাবে দ্রুত ভারতে যাওয়া যায়। দেশে বসে মরার চাইতে দেশের জন্য যুদ্ধ করে মরতে হবে। বাড়িতে এসে কয়েক জন বন্ধু মিলে পরিকল্পনা করলাম একটি গ্রুপ করতে হবে, আমরা নাম লিস্ট করলাম কে কে যুদ্ধে যাবে ছাত্র যুবক মিলিয়ে ১১ জন এর একটি গ্রুপ তৈরি

করলাম। যাদের নাম লেখা হলো তাদের মধ্যে ৭ জন ছাত্র ৪ জন যুবক– ১। আমি আব্দুর রহমান শেখ, ২। আব্দুল মান্নান মোল্লা, ৩। মোঃ শুকুর আলী হালদার, ৪। মোঃ খায়রুল কবির (বাকি), ৫। মোঃ আক্কাস মোল্লা, ৬। মোঃ সেন্টু বেপারী, ৭। শ্রী হরি, ৮। রনজিৎ কৃত্তনিয়া, ৯। সম্ভু সরকার, ১০। কালু ব্যাপারী, ১১। আব্দুস ছাত্তারসহ ১১ জন বন্ধু একত্রিত হলাম। মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে ভারতে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হলাম এবং পরিকল্পনা করলাম। যাওয়ার সময় আমাদের সাথে কি কি নিতে হবে এবং আমাদের পরিচয়পত্র কি কি নিতে হবে তা ঠিক করলাম। প্রথমে আমরা আমাদের এলাকার চেয়ারম্যান ও আওয়ামী লীগের সভাপতি, জনাব মোঃ আমজাদ হোসেন চোকদার সাহেবের কাছে গেলাম এবং তার কাছ থেকে একটি চিঠি লিখে নিলাম, সে একটি চিঠি লিখে দিয়ে আমাদেরকে বলে দিলেন, তোমরা আমার এই চিঠি আমাদের এমএনএ জনাব সামছুল হক সাহেবের কাছে নিয়ে দিবে এবং তাকে আমার সালাম জানাবে, সে তোমাদের সকল ব্যবস্থা করবেন। সে আগরতলা গকুলনগর ক্যাম্পের ক্যাম্পচিফ। ওনার সাথে গিয়ে দেখা করো। তারপর আমরা থানা আওয়ামী লীগের সভাপতি জনাব আব্দুল ওয়াহিদ ব্যাপারী সাহেবের কাছে গিয়ে দেখা করি। তিনিও আমাদেরকে একটি চিঠি লিখে দেন এবং তার ছালাম দিয়ে এমএনএ সামছুল হক সাহেবের কাছে তার চিঠি দেওয়ার কথা বলেন। তারপর আমরা আমাদের এম,পি জনাব আবদুল করিম ব্যাপারী সাহেবের সাথে দেখা করি, তিনিও আমাদেরকে একটি চিঠি লিখে দিয়ে এম এন এ সামছুল হক সাহেবের কাছে তার সালাম দিতে বলেন এবং আমাদের সকল ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য এমএনএ সাহেবের কাছে একটি চিঠি লিখে দিলেন। আমরা সকলের চিঠি নিয়ে বাড়িতে আসি এবং ভারতে যাওয়ার প্রস্তুতি নিতে থাকি। কোন দিন কোন সময় কিভাবে বাড়ি থেকে যাবো সে পরিকল্পনা করতে লাগলাম। প্রকাশ থাকে ইতোমধ্যে আমার এক ক্লাসমেট বন্ধু আমজাদ হোসেন। ওর বাড়ি ফরিদপুর জেলার পালের চর পদ্মা নদীর দক্ষিণ পাড়। আমার বাড়ি পদ্মার উত্তর পার আমরা একই স্কুলের ছাত্র। আমজাদ ওর এলাকায় একটি মুক্তিযোদ্ধা গ্রুপের সাথে যোগ দিয়ে যুদ্ধ করছে। ওদের গ্রুপের সকলেই ইপিআর ও পুলিশের লোক। ওরা বড় একটি ইঞ্জিন চালিত জেলে নৌকা দিয়ে অপারেশন করতে পদ্মা নদীর চরে উৎপেতে বসে থাকতো। যখন পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী গান বোর্ড ও লঞ্চ দিয়ে নদীর উপর দিয়ে যেতে দেখতো তখন ঐ ওরা ওদেরকে লক্ষ্য করে গুলি করতো, সবসময় পাকিস্তানি বাহিনীর উপর নজর দারী করতো, চরের এক পাড়ে নৌকা রেখে অন্য পাড়ে উৎপেতে বসে থাকতো এবং গানবোট লক্ষ্য করে গুলি করতো।



একদিন গভীর রাতে বন্ধু আমজাদ ওদের গ্রুপের সেই নৌকা নিয়ে আমার বাড়িতে আসে এবং মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে আমাকে পরিচয় করিয়ে দেয় এবং ঐ রাতেই ও আমাকে ওদের সাথে নিয়ে যায় এবং ভোর হওয়ার আগেই ওরা আমাকে আবার আমার বাড়িতে দিয়ে যায়। ওদের সাথে অনেক ভারী অস্ত্র ছিল যেমন থ্রি নট থ্রি রাইফেল, এস.এল.আর ইস্টেনগান, এলএমজি ও হ্যান্ড গ্রেনেট। ওরা আমাকে প্রায়ই আমার বাসা থেকে ওদের সাথে গভীর রাতে এসে নিয়ে যেত এবং বিভিন্ন অস্ত্রের নাম ও কিভাবে চালাতে হয় দেখাতো বেশ কিছু দিন ওদের সাথে ছিলাম। পরে আমার বন্ধু আমজাদকে বললাম দোস্ত আমরা ১১ জন এবং একটি গ্রুপ করেছি ভারতে যাবো। ঐখান থেকে ট্রেনিং নিয়ে এসে যদি বেঁচে থাকি তোমাদের সাথে যোগ দিব ইন্‌শাল্লাহ। ওরা আমাকে ভারতে যাওয়ার জন্য বলেছিল তোমরা কুমিল্লা বর্ডার দিয়ে ভারতে প্রবেশ করবে। এদিকে আমার ১১জন বন্ধু সবাই প্রস্তুত। আমিও ওদের সাথে আমার কথাগুলো শেয়ার করেছি। আমার বন্ধু আমজাদ হোসেন এর কথা বলেছি এবং ওরা আমাদেরকে যাওয়ার একটি পথের কথা বলে দিয়েছে। আমরা ওদের কথা মতো একটি তারিখ ঠিক করলাম। তারিখটি আমার ঠিক মনে নেই তবে সে দিন ছিল শুক্রবার। আমরা শুক্রবার রাত্র ১২টার সময় বের হয়ে যাবো একটি বড় কেরাইয়া নৌকা (ছই ওয়ালা নৌকা ঠিক করলাম) বাড়ির কেউ যেন জানতে না পারে। গভীর রাতে আমরা চলে যাবো প্রত্যেকে বাড়ীতে চিঠি লিখে রেখে আসলাম মা ও বাবাকে। চিঠিতে লিখে আসলাম আমাদের কথা কারও কাছে বলবেন না। বলবেন আমরা বেড়াতে গিয়েছি। যদি কারও কাছে বলেন, তবে পাকিস্তানি বাহিনীর লোক জানতে পারলে ঘর বাড়ি সব জ্বালিয়ে দিবে এবং আপনাদেরকেও মেরে ফেলবে। আমাদের কথা সম্পূর্ণ গোপন রাখবেন এবং আমাদের জন্য দোয়া করবেন। আমরা যেন ঠিকমত ভারতে গিয়ে পৌঁছতে পারি। আর যদি মরে যাই আমাদের মাফ করে দিবেন। আমরা দেশের স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধে যাচ্ছি ইনশাল্লাহ। জুলাই মাসের শুক্রবার রাতে ১২ টার সময় একটি বড় কেরাইয়া নৌকা ভাড়া করে প্রথম আমরা চাঁদপুর বেলতলী বাজার গিয়ে হাজী সাহেবের সাথে দেখা করি। তার নাতি ফেরদৌস ভাই আমাদেরকে বাজারের একটি পাটাতন করা দোকানে আমাদের থাকা ও খাওয়ার ব্যবস্থা করে দেন। ঐ দিন আমরা ঐখানে রাত যাপন করার পর সকালে একটি কেরাইয়া নৌকা যোগে কুমিল্লা রামচন্দ্রপুর বাজারে যাওয়ার জন্য রেডি হই। নৌকার মধ্যে আমরা ১১ জন, মাঝি দুই জন, এক জনে নৌকা বায় আরও একজন বৈঠা বায়। নৌকাটি ছিল বড় নৌকা আমরা নৌকার মাঝখানের পাটাতনগুলি উঠিয়ে নৌকার গুলুইর নিচে পাটাতন বিছিয়ে নিলাম এবং

আমরা বসলে যেন দূর থেকে আমাদেরকে না দেখা যায়। কিছু পাটখড়ি নৌকার মধ্যে নিয়ে নিলাম, নদী পথে যাওয়ার সময় আমরা ভয়ে ভয় ছিলাম, কারণ পাকিস্তানি গান বোর্ড থেকে হঠাৎ গুলি করতে পারে, তাই আমরা এমনভাবে যাচ্ছি যাতে তারা বুঝতে না পারে যে নৌকার মধ্যে কোন লোক আছে। নদী পথে আমরা ২/৩ বার হানাদার বাহিনীর গান বোর্ড এর বরাবর পড়েও ছিলাম। আমরা চুপ করে পাটখড়ি আমাদের উপরে দিয়ে শুয়ে ছিলাম। মাঝি খুব সতর্কতার সাথে সকল বিপদের থেকে আল্লাহর রহমতে আমাদেরকে রক্ষা করেছেন। আমরা আল্লাহর দরবারে কান্নাকাটি করেছি আল্লাহ তুমি আমাদেরকে রক্ষা করো। চোখের পানি ছেড়ে দিলাম আল্লাহ যুদ্ধ করে যেন মরতে পারি। কাপুরুষের মত যেন না মরি, তুমি আমাদেরকে জালিমের হাত থেকে রক্ষা করো। দুই দিন নৌকায় করে রামচন্দ্রপুর বাজারে এসে পৌঁছেছি। তখন বিকাল ৪টা হবে, বাজার থেকে আমরা কিছু খেয়ে নিলাম। পরে পথে খাওয়ার জন্য কিছু শুকনো খাবার, চিড়া ও বাতাসা কিনে নিলাম। আমাদের নৌকাটি একটি বড় পুলের মধ্যে বাধা ছিল। নৌকায় এসে সবাই যখন বসেছি, একটু পর ওখানকার মুক্তিযোদ্ধারা ২/৩টি নৌকা দিয়ে ভারি অস্ত্র শস্ত্র নিয়ে আমাদের কাছে আসলো এবং আমাদের পরিচয় জানতে চাইলো আমরা তাদের কাছে আমাদের পরিচয় দিলাম তাদেরও পরিচয় দিল। একজন এর নাম সিরাজ সাহেব তিনি গ্রুপ কমান্ডার সেনা বাহিনীর একজন কর্মকর্তা মেজর এর সাথে আমাদের পরিচয় হয়। এবং তিনি এসে আমাদেরকে বললেন, ভাই আপনারা এই বাজার থেকে চলে যান, আমরা এই ব্রিজটি উড়িয়ে দিব কারণ পাকিস্তানের সেনারা এই বাজার আক্রমণ করবে। কাজেই এই বাজার আপনাদের নিরাপদ নয়, আপনারা এখান থেকে কালিগঞ্জ বাজারে চলে যান। আমরা আপনাদের সাথে একজন লোক দিয়ে দিচ্ছি সে আপনাদের গাইড লাইন দিয়ে কালিগঞ্জ নিয়ে যাবে। ভাই আপনারা এখানে অবস্থান না করে আপনারা নৌকা যোগে চারকাস হয়ে মাঝার দিয়ে সি এন্ড বি বর্ডার পার হয়ে আগরতলা দিয়ে মাধবপুর স্কুল হয়ে ভারতে ত্রিপুরা ঢুকবেন। এই সকল পথ দিয়া যাওয়ার সময় আমাদেরমুক্তিযোদ্ধারাই আপনাদেরকে সহযোগিতা করবে। কোন চিন্তার কারণ নাই। আল্লাহ আপনাদের সহায় করুন। এখনই আপনারা চলে যান। কিছুক্ষণের মধ্যেই আমরা এই ব্রিজটি উড়িয়ে দেব। পাকিস্তানিরা যেন এই বাজার আক্রমণ করতে না পারে। ওদের কথামত আমরা ওখান থেকে কালিগঞ্জ বাজারের উদ্দেশ্যে রওয়ানা করি। বিকাল ৫টায় কালিগঞ্জ বাজারে এসে পৌঁছি। কালিগঞ্জ বাজারে এসে দেখি ঐখানকার মুক্তিযোদ্ধারা বাজারে বাঙ্কার তৈয়ার করতেছে। পাকিস্তানি হানাদারেরা এই বাজার আক্রমণ করবে। ঐখানকার মুক্তিযোদ্ধাদের



সাথে আমাদের পরিচয় হলে তারা আমাদেরকে বললেন। ভাই আপনারা এখানে অবস্থান না করে আপনারা নৌকা যোগে চারকাস হয়ে মাজার দিয়ে সিএন্ডবি বর্ডার পার হয়ে আগরতলা চলে যান। যাওয়ার পথে মুক্তিযোদ্ধারাই আপনাদেরকে সহযোগিতা করবে। আমরা তখন ওদের কথা মত নৌকা যোগে চারকাস এর উদ্দেশ্যে রওয়ানা করি। নৌকাগুলি ছিল তালগাছের মত লম্ব। তখন প্রায় সন্ধ্যা নৌকায় উঠার ৫/৬ মিনিট পর ঐ পাকিস্তানি হায়েনারা গান বোর্ড থেকে বৃষ্টির মত গুলি করতে লাগল কালিগঞ্জ বাজারকে টারগেট করে মারতে লাগলো। তখন আমরা নৌকায় মধ্যে প্রায় ৮/৯ টি নৌকায় আমরা অনেক মুক্তিযোদ্ধারা যাইতে ছিলাম। আমাদের সাথে অনেক মহিলাও ছিল। ৫/৬ জন গায়ক গায়িকা, শিল্পীও ছিল। গুলি লাগার ভয়ে আমরা সকলে এই নৌকা থেকে লাফিয়ে পানির মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ি এবং নৌকার পাশে মাথা রেখে সাতরাতে থাকি। প্রায় ২০/২৫ মিনিট আমরা পানির মধ্যে অবস্থান করি। তারপর নৌকায় উঠে চারকাস মাজারের উদ্দেশ্যে রওয়ানা করি। রাত প্রায় ৮/৯ টার মত হবে আমরা মাজারে এসে পৌঁছি এখানে এসে দেখি প্রায় ১৫০/১৬০ জনের মতো লোক এখানে জড়ো হয়েছে বর্ডার পার হওয়ার জন্য। ওখানকার মুক্তিযোদ্ধারা আমাদেরকে পরামর্শ দিলেন। বললেন, আপনারা সকলেই আপনাদের কাপড় চোপড় যা কিছু আছে ভাল করে শক্ত করে একটি ব্যাগের ভিতরে ঢুকান এবং শক্ত করে বেঁধে নিন। রাত ১১ টার মধ্যে আপনারা সিএন্ডবি বর্ডার পার হয়ে আগরতলা হয়ে মাধপপুর স্কুলে গিয়ে উঠবেন। ঐ স্কুলে আপনারা সকলেই রাত যাপন করবেন। পরের দিন সকালে, আপনাদেরকে ত্রিপুরা কংগ্রেস ভবনে নিয়ে যাবে। মনে রাখবেন আপনারা যখন বর্ডার পার হবেন তখন আপনারা আমাদের কমান্ড ফলো করবেন। আমরা আপনাদেরকে যেভাবে নির্দেশ দিব ঠিক সেভাবে বর্ডার পার হবেন। ভুল করলে কিন্তু বিপদে পরবেন। মনে রাখবেন বর্ডারে রাজাকারদের ক্যাম্প আছে। এই রাজাকার আসলে মুক্তিযোদ্ধা রাজাকার। ওদের ভূমিকা হলো, পাকিস্তানি হায়েনারা যখন গাড়ী নিয়ে টহল দিতে ওখানে আসবে, ঠিক ঐ সময় ওখানকার রাজাকার মুক্তিযোদ্ধারা ফায়ার করবে। হায়েনারা যখন ওখান থেকে চলে যাবে ১/২ মিনিট পর মুক্তিযোদ্ধা রাজাকারেরা একটি ফায়ার করবে। তখন বুঝতে হবে বর্ডার ক্লিয়ার, কোন ভয় নেই। এখন ঐ বর্ডার পার হতে হবে। আপনাদের যত শক্তি আছে দৌড় দিয়ে বর্ডার পার হয়ে পাহাড়ের উপরে উঠবেন। উঠতে একটু কষ্ট হবে। অনেক লোক যাওয়া আসার কারণে পাহাড় একটু পিচ্ছিল হয়ে আছে। যত দ্রুত পারেন পাকিস্তানি বাহিনীর নাগালে বাইরে চলে যাবেন। আমরা সবাই ওদের কথা মত তৈরি হয়ে গেলাম। ঠিক রাত ১১টা থেকে ১১.৩০ মিনিটের সময়

দেখতে পেলাম পাকিস্তানি সেনারা সিগনাল দিয়ে ঐ রাজাকার মুক্তিযোদ্ধাদের ক্যাম্পে যাচ্ছে ঠিক ঐ সময় ওরা ক্যাম্প থেকে গুলি ছুঁড়তে লাগলেন। ওখানে ২/১ মিনিট থাকার পর ওরা আবার চলে গেলেন। ওরা চলে যাওয়ার একটু পর ওরা একটি গুলি ফায়ার করলেন। ঠিক ঐ সময় আমরা আমাদের গায়ে যত শক্তি আছে দৌড়াতে শুরু করলাম; ২০/২৫ মিনিটের মধ্যে আমরা সিএন্ডবি বর্ডার পার হয়ে একটি ছোট খাল ছিল, সেই পানির মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়লাম, পানি থেকে উঠে পাহাড়ের উপরে উঠতে লাগলাম। একটু উপরে উঠি আবার পড়ে যাই, বহু কষ্ট করে পাহাড় পাড়ি দিয়ে আগরতলার উদ্দেশে রওয়ানা হই। তখন রাত প্রায় একটা হবে আগরতলা ঢুকে দেখি ভীষণ জঙ্গল, অন্ধকার রাত, অচেনা রাস্তা, কোন মানুষের সাড়া শব্দ নেই, ভীষণ ভয় লাগছিল। অনেক মানুষ এক সঙ্গে থাকাতে ভয়কে জয় করে হাঁটতে লাগলাম। একটু দূরে গিয়ে দেখি একটি ৭/৮ বৎসরের ছেলে একা একা একটি ভাঙ্গা ঘরের মধ্যে বসে কাঁদছে, আমরা ওকে জিজ্ঞেস করলাম তুমি কাঁদছো কেন? ও বলল, পাকিস্তানি সেনারা আমার মা বাবাকে ধরে নিয়ে গিয়েছে। ছেলেটিকে আমাদের সাথে নিয়ে গেলাম ও আমাদেরকে রাস্তা দেখিয়ে মাধবপুর স্কুলে নিয়ে গেল। তখন রাত প্রায় ৩টা ৪টার মত হবে স্কুলে এসে দেখি স্কুলে প্রায় ৪/৫ শত মুক্তিযোদ্ধা একত্র হয়েছে। আমাদের সাথে যে সকল শিল্পীরা গিয়েছিল, ওরা রাত ভর স্বাধীনতার গান গাইতে লাগলো। রাত তিনটার পরে যে মুক্তিযোদ্ধারা বর্ডার পার করেছে সেই সময় অনেক মুক্তিযোদ্ধাকে বর্ডার পার হওয়ার সময় পাকিস্তানি হায়েনারা মেরে ফেলেছে। ঐ দিন রাতে প্রায় ২/৩ শত মানুষকে ওরা ঐ বর্ডারে মেরে ফেলেছে। পরদিন সকাল ১০ টার সময় মাধবপুর স্কুলে আমাদেরকে কংগ্রেস ভবনে নেওয়ার জন্য ৯/১০টি ট্রাক আসলো। আমাদের কাছে যার যা কিছু খাওয়ার ছিল তা খেয়ে ট্রাকে উঠলাম। ট্রাক এসে ত্রিপুরা কংগ্রেস ভবনে আমাদেরকে নামিয়ে দিল। আমরা ঐখানে নেমে দেখলাম অনেক মুক্তিযোদ্ধা এখানে জমা হয়েছে। ওরা আমাদের সকলের নাম এর লিস্ট করতে লাগলো। ঐখানকার পুলিশেরা আমাদের পুলিশ কার্ড করে দিলেন পুলিশ কার্ড করে এবং এই পুলিশ কার্ডই আমাদের মুক্তিযোদ্ধার পরিচয়। কংগ্রেস ভবনে আমরা ২য় তলায় দুই দিন অবস্থান করি এবং আমরা এম এন এ সামছুল হক সাহেবের সাথে যোগাযোগ করি। দুই দিন পর কংগ্রেস ভবনে দেখা হয় এমএনএ জনাব সামছুল হক সাহেব, ও তোফায়েল আহমেদ সাহেবের সাথে এবং মুহিউদ্দিন ভাই এর সাথে স্বাক্ষাৎ হয়। আমাদের নেয়া চিঠিগুলি এমএনএ সামছুল হক সাহেবের কাছে দেই। তিনি চিঠিগুলি পড়ে তাদের সকলের সম্বন্ধে জানতে চান আমরা তার কাছে তাদের সকলের ছালাম জানাই এবং দেশের সার্বিক বিষয়



তার কাছে খুলে বলি। মুহিউদ্দিন সাহেবও আমাদের কাছ থেকে দেশের কথা জানতে চান, তার কাছেও মুন্সিগঞ্জের সব কথা খুলে বলি। মুহিউদ্দিন ভাই তা সামছুল হক সাহেবকে বলেন। ওদেরকে যত তাড়াতাড়ি পারেন আপনার ক্যাম্পে নিয়ে ট্রেনিং করে দেশে পাঠানোর ব্যবস্থা করেন। এম এন এ সামছুল হক সাহেব আমাদেরকে বলেন, তোমরা কিছু দিনের জন্য হ্যাপানিয়া সোনার বাংলা ক্যাম্পে থাকো, ঐ ক্যাম্পের চিফ আমার বন্ধু সামছুল হুদা সাহেব আছে। আমি তার কাছে একটি চিঠি লিখে দিচ্ছি তোমরা ওখানে কিছুদিন থাকো পরে আমি তোমাদেরকে আমার ক্যাম্পে নিয়ে আসবো। এই কথা বলে ঐ দিন ঐ একটি চিঠি লিখে দিয়ে আমাদেরকে হ্যাপানিয়া সোনার বাংলা ক্যাম্পে পাঠিয়ে দেন। আমরা ক্যাম্পে এসে ক্যাম্পচিফ হুদা সাহেবের কাছে এমএনএ সামছুল হক সাহেবের চিঠিটি দেই। ক্যাম্পচিফ প্রফেস্যার সামছুল হুদা সাহেব আমাদেরকে গ্রহণ করেন। সেখানে আমরা প্রশিক্ষণ নেই। প্রশিক্ষণ দেন ইন্সট্রাক্টর আব্দুস ছাত্তার সাহেব। আমরা প্রায় দুই মাস ঐ ক্যাম্পে প্রশিক্ষণ নেই। আমি আমাদের এমএনএ সামছুল হক সাহবেরে সাথে সর্বক্ষণ যোগাযোগ রাখি এবং সেই উক্ত ক্যাম্পে আমি কিছু দিন প্লাটুন কমান্ডারের দায়িত্ব পালন করি এবং দেশের সাথে যোগাযোগ রাখি। এই ক্যাম্পে একদিন আমাদের গ্রুপের শুকুর আলীর অবস্থা খারাপ হয়ে যায়, ওর প্রশ্রাব বন্ধ হয়ে যায়। তখন রাত প্রায় ১১টা/১২টা বাজে। ওর চিৎকারে আমরা ভয় পেয়ে যাই, হুদা সাহেব আমাদেরকে বলেন আপনারা ওকে ত্রিপুরা হাসপাতালে ভর্তি করেন। ঐ ক্যাম্পে অস্থায়ী প্রধানমন্ত্রী জনাব তাজউদ্দিন আহামেদ সাহেবের এক শ্যালক তৎকালীন পি.আই ডিসির জেনারেল সেক্রেটারী আবদুর রহমান সাহেব আমাদের ক্যাম্পে ছিলেন। ওনার সাথে আমার অনেক ভাল সম্পর্ক ছিল। আমি তখন ওনার কাছে যাই, তিনি হাসপাতালে টেলিফোন করে এম্বুলেন্স আনান, পরে শুকুর আলীকে আমি ও খায়রুল কবির হাসপাতালে নিয়ে যাই। ওকে হাসপাতালে রেখে আমরা রাতে ঢাকা হাউজে চলে আসি। ঢাকা হাউজের তখন দায়িত্ব ছিল খায়রুল কবিরের বড় ভাই মোস্তাক আহাম্মেদ। ওনার কাছে গিয়ে দেখি, ওখানে আছেন জনাব তোফায়েল আহমেদ ও মুহিউদ্দিন ভাই, তাদের সাথে আমাদের আবার দেখা হয়। মুহিউদ্দিন ভাই বলেন, চলো তোমাকে আমি উচ্চ ট্রেনিং এর জন্য পাঠাবো, তুমি আমার সাথে চলো। আমি তখন মুহিউদ্দিন ভাইকে বললাম ভাই, আমরা ১১ জন এক সাথে এসেছি। ওদেরকে ফেলে আমি একা চলে গেলে ওরা মনে দুঃখ পাবে। আমাদের সবাইকে এক সাথে পাঠিয়ে দেন। তা হলে তোমাদের একটু অপেক্ষা করতে হবে। ঐ দিন রাতে মুহিউদ্দিন ভাই ও তোফায়েল ভাই এর সাথে আমরা ঢাকা হাউজে অবস্থান করি

এবং এক সাথে খাওয়া দাওয়া করি। পরে আমি ও আমার বন্ধু খায়রুল কবির, শুকুরকে দেখার জন্য হাসপাতালে যাই। হাসপাতাল থেকে মুক্তিযোদ্ধা শুকুর আলীকে নিয়ে পরে আমরা আমাদের ক্যাম্পে চলে আসি। হ্যাপানিয়া ক্যাম্পগুলোর খাওয়া দাওয়া এত খারাপ ছিল যে, বলা যায় না। হ্যাপানিয়া ৭টি মুক্তিযোদ্ধা ক্যাম্প ছিল। ১। বঙ্গবন্ধু ২। বঙ্গ সারদুল ৩। তিতাস ৫। পদ্মা ৫। মেঘনা ৬। যমুনা ৭। সোনার বাংলা। আমরা সোনার বাংলা ক্যাম্পে থাকতাম। আমাদের ক্যাম্পের ক্যাম্পচিফ প্রফেসার সামছুল হুদা সাহেব, তার বাড়ী ছিল ময়মনসিংহ। ভাত খাওয়ার সময় প্রতি লোকমায় খেতে হতো বালু আর কণা। প্রতিটি রুটির মধ্যে ছিল বালুকণা। এই সব খেয়ে সকলে ক্যাম্পের মুক্তিযোদ্ধাদের আমাশয় হয়ে গিয়েছিল এবং পায়খানার সাথে অনেক রক্ত যেত, মুক্তিযোদ্ধারা অসুস্থ হয়ে গিয়েছিল আমাদের খাদ্যের তালিকায় প্রতিদিন ছিল মুসরীর ডাল। এই জন্য আমরা ক্যাম্পে বসে, আমাশার একটি নামতাও বানিয়েছিলাম। নামতাটি এইরূপ লিখেছিলাম। ডাইল অক্কে ডাইল, ডাইল দোগনে কশা, তিন ডাইলে আমাশা, চার ডাইলে রক্ত, পাঁচ ডাইলে ট্রেনিং, ছয় ডাইলে অপারেশন, সাত ডাইলে মৃত্যু। মাঝে মাঝে পাকিস্তানি সেনারা রাতে আমাদের মুক্তিযোদ্ধা ক্যাম্পগুলোকে লক্ষ্য করে বাংলাদেশের বর্ডার থেকে শেলিং ছুড়তো। তখন আমরা মুক্তিযোদ্ধারা ব্যারাক থেকে বের হয়ে বাঙ্কারে ভিতর চলে যেতাম। কয়েক ঘণ্টা আমরা বাঙ্কারে থাকতাম। একদিন আমরা অল্পের জন্য প্রাণে বেঁচে গেছি। লক্ষভ্রষ্ট হয়ে আমাদের মুক্তিযোদ্ধা ক্যাম্পের সাথেই ছিল আগরতলার ট্রেন লাইন। আমাদের ভাগ্য ভাল ছিল, শেলিংটি আমাদের ক্যাম্পে না পরে ট্রেন লাইন এর উপরে গিয়ে পড়ে। টেন লাইনটি উপড়ে যায়, একদিন ট্রেন লাইন বন্ধ ছিল। মুহিউদ্দিন ভাই ও তোফায়েল আহমেদ সাহেবের সাথে কথা বলে ঢাকা হাউজ থেকে আসার পর আমি গোকুলনগর ট্রেনিং ক্যাম্পের ক্যাম্পচিফ এমএনএ জনাব সামছুল হক সাহেবের সাথে গিয়ে দেখা করি। পরে সামছুল হক সাহেব আমাদেরকে তার ক্যাম্পে নিয়ে রেখে দেশে পাঠিয়ে দেন এবং বলেন তোমরা বাচ্চু হালদার ও আবদুর রব সাহেবের সাথে দেখা করো। আমরা ৭১ ইং অক্টোবর ২ তারিখে বাংলাদেশের উদ্দেশে কুমিল্লা চারকাস বর্ডার দিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করি। কুমিল্লা নবীনগর বাজার এসে ভারতীয় সেনাবাহিনীর সাথে আমাদের সাক্ষাৎ হয়। ভারতীয় সেনারা ওখানে অবস্থান করছিল। দেশে এসে আমি বাচ্চু হালদার সাহেবের সাথে ও রব সাহেবের সাথে দেখা করি এবং দিঘীর পার ইউনিয়ন নশংক বাইন খাড়া গার্ডের বাড়ীর বিল্ডিংএর ২য় তলায় আমাদের মুক্তিযোদ্ধা ক্যাম্পে উঠি। ঐ ক্যাম্পের কমান্ডার আলী আকবর ও টুআইসি চাঁন



মিয়াসহ আমরা প্রায় ১৪/১৫ জনের একটি গ্রুপ মুক্ত মুক্তিযোদ্ধা ক্যাম্প। ক্যাম্পের সার্বিক দায়িত্ব পালন করেন বাচ্চু হালদার ও আঃ রব সাহেব। কমান্ডার আলী আকবরের নেতৃত্বে যুদ্ধের জন্য সার্বিকভাবে প্রস্তুতি নেই। বিভিন্ন গ্রাম থেকে স্বাধীনতা বিরোধী রাজাকার ও শান্তি কমিটির লোকদেরকে ক্যাম্পে ধরে এনে মুচলেখা নিয়ে আমাদের পক্ষে কাজ করার অঙ্গিকার নিয়ে পরে ছেড়ে দেই। বিভিন্ন গ্রামে রাতের বেলা জনগণকে সংগঠিত করার কাজ করি। বড় কোন যুদ্ধের অংশগ্রহণ করার সুযোগ না হলেও নারায়ণগঞ্জ সোনারগাঁও সিএন্ডবি গোডাউনের পিছনে একটি বড় কবর স্থানে বাঙ্কার করে কিছু রাজাকার ও পাকিস্তানি সেনা আত্মগোপন করে আছে এই খবর পাই। রাত হলে ওরা বের হয়ে মানুষকে আক্রমণ করে ও লুণ্ঠন করে। ওখানকার কমান্ডার আক্কাস ভাই সকল মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়ে ঐ কবরের স্থানে অপারেশন করার জন্য প্রস্তুতি নেন। সৌভাগ্য হয়েছিল সে দিন আমি ও আব্দুল মান্নান মোল্লা আমাদের এক আত্মীয়ের বাসায় বেড়াতে গিয়েছিলাম। ওখানকার কমান্ডার ও মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে পরিচয় হয় এবং তারা আমাদেরকে ঘটনাটি বলেন এবং আমাদেরকে তাদের সাথে থাকতে বলেন। ঐ দিন রাত্রে ১২/১ টার সময় অপারেশন শুরু হয় এবং তাদের সকলকে ধরে ও পরে গণপিটুনি দিয়ে সকলকে মেরে কবরস্থানের এক পাশে কবর দেয়া হয়। পরে মুক্তিযোদ্ধা বন্ধুদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে আসি ঢাকা সূত্রাপুর মায়া চৌধুরী সাহেবের বাসায়। তার বড় ভাই জীবন চৌধুরীর সাথে আমার পরিচয় ছিল। তাদের বাড়ীতে স্বাক্ষাত করে পরে আমরা সেগুনবাগিচা এমপি এ্যাডভোকেট আসাদুজ্জামান খান সাহেবের সাথে স্বাক্ষাত করি। ওনার পি এ ছিলেন আমার মামা আব্দুস সামাদ মোল্লা। এমপি সাহেবের সাথে আমাদের অনেক কথা হয় এবং আমাদের কাছ থেকে উনি অনেক কথা শুনেন। আমরা তাকে প্রশ্ন করে ছিলাম আপনি ভারতে যাননি কেন? ওনি বলেছেন যাওয়ার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু সুযোগ পাই নি। চেষ্টা করেছিলাম, টিক্কা খান আমাকে ধরে নিয়ে যায়। তাদের পক্ষে কথা বলার জন্য। কিন্তু আমি কোন কথা বলিনি। পেও আমরা ঢাকা থেকে গ্রামের বাড়ীতে আসি এবং আমাদের ক্যাম্পে যাই। ১৫ নভেম্বর ৭১ আমাদের টঙ্গিবাড়ী থানা কমান্ডার জনাব সামছুল হক সাহেবের নেতৃত্বে হানাদার মুক্ত করার জন্য থানার সকল মুক্তিযোদ্ধা একত্রিত হই এবং যুদ্ধ করে হানাদার মুক্ত করি। ১৬ ডিসেম্বর ঐতিহাসিক রেসকোর্স ময়দানে মুক্তিযোদ্ধা ও মিত্র বাহিনীর কাছে পাকিস্তানি বাহিনী আত্মসমর্পণ করে। মুক্তিযোদ্ধারা দীর্ঘ নয় মাসের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ করে বিজয় ছিনিয়ে আনে। অর্জন করি স্বাধীন ও সার্বভৌম একটি রাষ্ট্র। এই স্বাধীনতা অর্জনে অংশগ্রহণ করতে পেরে আমি গর্বিত।

## বীর মুক্তিযোদ্ধা শেখ সাঈদ আলী

**ছোটকা, ইউ এ খালিয়া, গোপালগঞ্জ**

ছাত্র আন্দোলনের মূলঘাটি ছিল মজিদ মেমোরিয়াল সিটি কলেজ, খুলনা। আব্বা সিটি কলেজের ছাত্রলীগের ছাত্রনেতা। (সাংগঠনিক ও সাংস্কৃতিক বিষয়ক সম্পাদক)ছিলেন দুই টার্ম। খুলনায় আন্দোলনের চরম অবস্থা ঘটে ২১ শে ফেব্রুয়ারি। আজকের শহীদ হাদিস পার্ক যার নামে, শহীদ হাদিস যে মিছিলে গুলিবিদ্ধ হয়ে শহীদ হন সেই মিছিলেই ছিলেন আব্বা, আব্বার হাতে গুলি লাগে,আহত হন, এই বইটি পড়লে সব তথ্য পাওয়া যাবে। মরহুম মুহাম্মদ আব্দুল হালিম রচিত "খুলনার ঐতিহ্য " বইটিতে এই তথ্য পেয়েছি, শ্রদ্ধা জানাই মানুষটির প্রতি। অবশ্য একটু ভুল আছে, এখানে লিখেছেন শেখ সাঈদ আলীর গ্রামের বাড়ী নড়াইলের লোহাগড়ার ঘাঘা গ্রামে। হ্যা ঘাঘা গ্রামের বিশ্বাস বাড়ী হচ্ছে আমার মায়ের মামাবাড়ী। আব্বা ৮ নম্বর সেক্টরে যুদ্ধ করেছেন, নেতৃত্ব দিয়েছেন। অস্ত্র ও গোলাবারুদ থাকতো আমার নানা বাড়ীতে আমার মা ও আব্বার সাথে রনাঙ্গনে যুদ্ধ করেছেন। আমার দাদাবাড়ী গোপালগঞ্জের জালালাবাদ ইউনিয়নের ছোটফা গ্রামের শেখবাড়ী। আব্বা নড়াইলের লোহাগড়া ইউনিয়নের কে ডি আর কে স্কুল হতে ১৯৬৫ সালে এসএসসি পাশ করে খুলনা সিটি কলেজে ভর্তি হয় এবং স্কুল জীবন থেকেই লেখালেখি ও ছাত্র রাজনীতির সাথে জড়িত। বিএল কলেজে এমএ পড়া কালীন স্বাধীনতার যুদ্ধ শুরু হয়। ২৫ শে মার্চ কালো রাতেই পাড়ি জমালেন ট্রেনিং নিতে বন্ধু রাষ্ট্র ভারতে। ১৯৭৫ সালে ১০ই অক্টোবর প্রতিষ্ঠা করেন জাতির জনকের নামের উপরে প্রথম সংগঠন "বঙ্গবন্ধু সাংস্কৃতিক পরিষদ" যার উদ্দেশ্য ছিল এই সংগঠনের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস তুলে ধরা।

আমরা খুব বেশি আশা করি না, এই মানুষগুলো হারিয়ে গেছে। সত্যিকারের মুক্তিযোদ্ধার সন্তান দেশ ও জাতির সাথে বেঈমানি করতে শেখে নাই। এই সূর্য সন্তানদের নামে কিছু হোক, আজকের এই দেশ লক্ষ লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে স্বাধীন হয়েছে, একদিনে এ দেশ আসেনি। এদের যথাযথ মুল্যায়ন হোক, কোথায়



কিভাবে আছে শহীদ হাদিসের কবরটা? শুনেছি সিমেট্রি রোডে আছে বালক প্রদীপের কবর, এনারা কোন সম্পদের আসায় তখন রাজপথে নামেনি। নেমেছিল বাংলায় কথা বলতে স্বাধীনভাবে বাঁচতে। কই আমার বাবা তো কোন দিন তার হাতে লাগা গুলির আঘাতের চিহ্ন দেখিয়ে ভাতা দাবী করে নাই।

আমার বাবার যে ভূমিকা তখন ছিল খুলনাতে যারা এখন অবস্থানের শেখরে তারাই বুকে হাত দিয়ে বলুক কার কতটা অবদান ৭৫ এর পরে। বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে কথা বলার ও মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে কথা বলার ছিল না কোন প্লাটফর্ম। এই "বঙ্গবন্ধু সাংস্কৃতিক পরিষদ" এর ব্যানারে সবাই দাঁড়িয়েছে, সারা দেশে আব্বা ৭৩ টি কমিটি করে যেতে পারেন, তার পরে আব্বা ২০০৭ সালে অসুস্থ হয়ে পড়েন, আমার লিখতে কষ্ট হয় আমার বাবা নেই, ২০১৬ সালের ৭ই নভেম্বর চলে যান না ফেরার দেশে। আমরা ঠিক মত চলতে পারি নাই তবু আমার আব্বা চাকুরীর বেতন দিয়ে এই সংগঠনের কার্যক্রম চালিয়ে গেছেন, তুলে ধরেছে বঙ্গবন্ধুর শোষণহীন সমাজ ব্যাবস্থার কর্মসূচি, কি চেয়েছিলেন জাতির জনক করতে, তার বক্তৃতায়, কবিতা গান, নাটকের মাধ্যমে। যতবারই প্রোগ্রাম নিয়েছেন, এন এস আই সিভিলে যেয়ে গ্রেফতার করেছে আব্বাকে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী,

আপনার হাতে ম্যান্ডেট, আপনিই পারেন এই সূর্য সন্তানদের যথাযথ মূল্যায়ন করতে।

আমার বড় পরিচয় আমি বীর মুক্তিযোদ্ধা শেখ সাঈদ আলীর মেয়ে শেখ লুৎফুন্নাহার পলাশী।

## বীর মুক্তিযোদ্ধা এনায়েতুর রহমান

**উত্তর বাশবাড়ীয়া, ডুমুড়িয়া, টুঙ্গীপাড়া, গোপালগঞ্জ**

আমি ১৯৭১ সালে ভারতের চাকুলিয়ায় ভারতীয় সেনাবাহিনীর প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে প্রশিক্ষণ শেষে ৯নং সেক্টর হেড কোয়াটারে রিপোর্ট করি, সেখান থেকে আমাকে হিঙ্গলগঞ্জ অপারেশন ক্যাম্পে নিযুক্ত করা হয়, ২১ শে নভেম্বর, ১৯৭১ পর্যন্ত নুতন ভাবে ভারতে আসা ছেলেদের প্রশিক্ষণ দিতে থাকি। ২২শে নভেম্বর ভোর রাত্র থেকে আমাদের ক্যাম্পের ঠিক ওপারে বসন্তপুর সীমান্তে অবস্থানরত পাকবাহিনীর প্রচন্ড গোলাগুলি শুরু হয় এবং এক পর্যায়ে বেলা আনুমানিক ১১/১২টার দিকে পাকবাহিনী সীমান্ত এলাকা ছেড়ে পিছু হটতে থাকলে আমরা ভিতরে ঢুকে তাদেরকে তাড়া করতে করতে পারুলিয়া ছেড়ে কুলিয়া শ্রীরামপুর (প্রায় ১৩/১৪ কিমি) লোহার ব্রীজের ওপারে অবস্থিত পাকবাহিনীর আর একটি ক্যাম্প পর্যন্ত নিয়ে আসি, লোহার ব্রীজের এপারে আমরা অবস্থান নেই এবং ওপারে পাকবাহিনী অবস্থান নেয়। সেখনে প্রায় ১৫/১৬ দিন যুদ্ধ করার পরে সম্ভবত ৭/৮ই ডিসেম্বর পাকবাহিনী পুনরায় পিছু হটতে হটতে সাতক্ষীরা শহরে এসে অবস্থান নেয় এবং আমরাও শহরের কাছাকাছি অবস্থান করি। ৪/৫ দিন খণ্ড খণ্ড যুদ্ধ হওয়ার পরে সম্ভবত ১২/১৩ই ডিসেম্বরের দিকে পাকবাহিনী সাতক্ষীরা শহর থেকে শাহাপুর এসে অবস্থান নেয়, আমরাও পিছু পিছু ধাওয়া করতে করতে শাহাপুর পৌছালে পাকবাহিনী অবস্থান পরিবর্তন করে ফুলতলা হয়ে শিরমনিতে অবস্থিত সোনালী জুট মিলের মাঠে অবস্থান নেই, ইতিমধ্যে আমরা শাহাপুরে পৌছালে ভারতীয় সেনাবাহিনীর সাজোঁয়া ও ট্যাঙ্ক বহর আমাদের সঙ্গে যোগ দেয়, ৯নং সেক্টর কমান্ডার মেজর এমএ জলিল এবং বাংলাদেশ সেনাবাহিনী (স্বাধীনতা ব্যচ) এর অফিসার লেঃ মঈনুল ইসলাম, লেঃ সচিন কর্মকার সহ আরও কয়েকজন অফিসার ভারতীয় সাজোঁয়া ও ট্যাঙ্ক বহরকে নেতৃত্ব দিয়ে আগাতে থাকেন এবং আমাদের কে তাদের পিছনে পিছনে আগাতে বলেন, এভাবে আমরা ফুলতলা পৌছালে আমাদের ও মিত্রবাহিনীর অফিসারগণ আমাদেরকে ফুলতলাতে পরবর্তী নির্দেশ না পাওয়া পর্যন্ত অবস্থান করতে বলেন এবং তারা সাজোঁয়া ও ট্যাঙ্ক বহর নিয়ে শিরমনিতে অবস্থানরত পাকবাহিনীর সঙ্গে মুখোমুখি যুদ্ধ শুরু করেন এবং সে যুদ্ধে উভয় পক্ষের প্রায় দুই শতাধিক সেনা নিহত হয়। অবশেষে ১৬ই ডিসেম্বর পাকবাহিনী আত্মসমর্পণের ঘোষণা দেয়ায় এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের অবসান ঘটে ও জন্ম নেয় একটি স্বাধীন দেশ যার নাম "বাংলাদেশ "

## যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধা আবু মো. সরোয়ার হোসেন

**বাঁশখালী, চট্রগ্রাম**

আমি ছোট বেলায় খুবই চঞ্চল ও প্রতিবাদী ছিলাম, দেশপ্রেম জাগ্রত ছিল তখন থেকেই। স্কুল ও মাদ্রাসায় পড়াকালে যখন জাতীয় সঙ্গীত গাইতে হতো, তখন পাকিস্তানের কিছু ভালো লাগতো না বলেই মনের অজান্তেই অনেক উল্টাপাল্টা শব্দ বেরিয়ে আসতো মুখ থেকে, এ নিয়ে শিক্ষকরা বিচার শালিসও করতেন।

মুক্তিযুদ্ধে আমার অংশগ্রহণের প্রতিটা দিনই ছিল এক একটা ইতিহাস, তা "মুক্তিযোদ্ধার ইতিহাস সংরক্ষণ কমিটি বাংলাদেশ" এর ওয়েবসাইটে (www.mssangsad.com) সংরক্ষিত আছে ভিডিও আকারে আমার প্রোফাইলে। মাতৃভুমিকে মায়ের মতো ভালোবাসতে পেরেছিলাম বলেই নিজের শরীরের রক্ত দিয়ে মাতৃভূমিকে সিক্ত করেছি, ত্যাগ আর বীরত্ব দিয়ে প্রমাণ করতে পেরেছি দেশের প্রতি ভালোবাসা।

একজন মুক্তিযোদ্ধা বা মুক্তিযোদ্ধার সন্তান প্রয়োজনীয় সনদে প্রমাণিত হয়, রাষ্ট্রের কাছে সুযোগ-সুবিধা গ্রহণের ক্ষেত্রে। কিন্তু জনসাধারণের নিকট বিশেষ করে নতুন প্রজন্মের নিকট কিভাবে সেটা তুলে ধরা হবে? নিশ্চয়ই সেটা ঢাক-ঢোল পিটিয়ে বা কোন প্রচার মাধ্যমে হবে না, আর তা না হলে প্রজন্ম জানবেও না, কোনদিন আমাদের (বীর মুক্তিযোদ্ধাদের) ত্যাগ ও আদর্শের কথা তথা বীরত্বের ইতিহাস। যদি তেমনটি না হয় তাহলে নতুন প্রজন্মের মধ্যে কিভাবে দেশপ্রেম জেগে উঠবে?

নতুন প্রজন্মকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় গড়ে তুলতে এবং মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ করতে হলে অবশ্যই বাঙ্গালির ইতিহাসের সর্বকালের মহানায়ক জাতির পিতার ডাকে সারা দিয়ে দেশমাতৃকার জন্য জীবন উৎসর্গকারী বীর মুক্তিযোদ্ধাদের বীরত্বগাঁথা ইতিহাস চর্চায় উৎসাহিত করতে হবে বলে আমি বিশ্বাস করি।